1/3/245

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি

অবন্তীকুমার সান্যাল

A 4552

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী :: কলিকাতা ৬

RABINDRANĀTHER GADYARĪTI
Abântikumar Sanyal
Price Rs. 5·00

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৩৭৬

দাম পাঁচ টাকা

Acc. No. 4552
Date 7/4/15
Call No. 891.44301/SAN

মুদ্রাকর
সারস্বত প্রেস
বিভাস ভট্টাচার্য
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

Jangipur College Library
4552

শ্রীমতী শ্যামলী ও শ্রীমান কল্যাণকে।

বক্তব্য

রবীন্দ্রনাথের ভাষা-রীতির বিস্তারিত আলোচনা আজও হয় নি। পদ্যের ভাষা-রীতি নিয়ে অধুনা কিছুটা আলোচনা সুরু হলেও গদ্যের রীতি নিয়ে আলোচনা একেবারেই বিরল। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্যের ভাষা-রীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা যে অতিশয় শ্রমসাধ্য, তা অনস্বীকার্য।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমি রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিবর্তনের রূপরেখাটি মাত্র ধরতে চেষ্টা করেছি। ভাষার রীতির রূপপরিবর্তন যে কখনই লেখকের খেয়াল-খুশির পরিণাম নয়, ভাববস্তুর প্রকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত—এইটি মনে রেখে তাঁর গদ্যরীতির রূপপরিবর্তনের ধারাবাহিকতা এবং চরম পরিণতির গতিরেখাটি স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছি। ভাষা-রীতির আলোচনা মূলত স্টাইলের আলোচনা হলেও, সামগ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে রীতির বহিরঙ্গ রূপের—যেমন, বাক্যগঠন, শব্দপ্রয়োগ, অলংকরণ ইত্যাদির—আলোচনাটি অপরিহার্য। কিন্তু আমি সেই আলোচনার গভীরে প্রবেশ করতে চাই নি এইজন্য যে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার নিছক বহিরঙ্গ রূপের আলোচনা কেউ কেউ করেছেন। আমি তাঁর গদ্যরীতির অন্তরঙ্গ রূপটিরই পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। এবং তাতে সফলতা লাভ করতে পেরেছি কি না, তা সুধীজনেরই বিচার্য।

এই গ্রন্থরচনায় আমি সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের চার খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী থেকে। যাবতীয় উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে। অসাবধানতা বশত কিছু কিছু মুদ্রণত্রুটি ঘটেছে, দুই জায়গায় "বংকিমচন্দ্র" (পৃঃ ১৪), এক জায়গায় "চৈতালী" (পৃঃ ৮৩) ছাপা হয়েছে। অন্যান্য মুদ্রণত্রুটিগুলি তেমন গুরুতর নয় বলে পৃথক শুদ্ধিপত্র যোগ করা হয় নি।

গ্রন্থের মুদ্রণযোগ্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে দিয়েছেন আমার অশেষ প্রীতির অধিকারিণী ছাত্রী অধ্যাপিকা শ্রীমতী বিজয়া চক্রবর্তী, নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে

দিয়েছেন স্নেহভাজন ছাত্র ও সহকর্মী অধ্যাপক ড: সত্যনারায়ণ দাস। রবীন্দ্রনাথের নাটকের গদ্য সম্পর্কে সময়োচিত ও সুচিন্তিত মতামতের জন্য আমি বিশেষভাবে ঋণী সহকর্মী অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হল অনুজপ্রতিম বিভাস ভট্টাচার্য ও অশোক ভট্টাচার্যের আগ্রহ ও উৎসাহে, বহুকালের প্রীতি ও সৌহার্দের সুতোয় নতুন করে আর একটা গিঁট পড়ল।

কোজাগরী পূর্ণিমা
১৩৭৬

অবন্তীকুমার সান্যাল

রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁর গদ্যরচনার পরিমাণ বিপুল। এবং সেই বিপুল পরিমাণ রচনার বিষয়ও বিচিত্র। গল্প, উপন্যাস তো বটেই, সমাজনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য-সমালোচনা, আত্মজীবনী এমন কি বিজ্ঞান, শব্দতত্ত্বও তাঁর রচনার বিষয়ভুক্ত। এই বিচিত্র বিষয়ের অনুকূল উপযোগী ভাষা ও রীতির অনুশীলন তিনি শিশুকাল থেকে শুরু করেছিলেন। এবং সেই অনুশীলনের পর্বে পর্বে কখনো তিনি কোনো রীতিকে আঁকড়ে ধরেছেন, কখনো দ্বিধাগ্রস্তের মতো কোনো রীতির অনুসরণ করেছেন, কখনো বা ত্যাগ করেছেন, আবার কখনো পুরনো রীতিতেই ফিরে গেছেন। ভাবের অব্যর্থ বাণীরূপের সাধনায় প্রবলভাবে সচেতন শিল্পীমনের স্বাভাবিক অতৃপ্তির অস্থিরতার চিহ্নও তাঁর বিচিত্র গদ্যরচনাগুলিতে সুস্পষ্ট। এই কারণেই তাঁর গদ্যরীতির বিবর্তন পদ্যরীতির মতো সরলরেখ নয়, "নানা অগ্র-পশ্চাৎ গতির অসম ছন্দে আন্দোলিত।" তাঁর ধারাবাহিক গদ্যরচনা স্বয়ংসম্পূর্ণ, কাব্যরচনার পরিপূরক বা সম্পূরক নয়, সমান্তরাল রেখায় প্রসারিত। তবু বহুক্ষেত্রে তাঁর গদ্যরচনার ভাষা, রীতি ও ভাবের পারম্পর্যের সূত্রটি হয়তো পদ্যের বিচরণ ভূমিতে খুঁজে নিতে সুবিধা হয়। আবার অন্যদিকে ভাষা ও রীতির ক্ষেত্রে এই গদ্যেই পদ্যের চেয়ে তাঁর আশু সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল।

ভাষা ও রীতির বিবর্তনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গদ্যরচনাকে চারভাগে স্বচ্ছন্দে ভাগ করা চলে। রীতির ক্ষেত্রে তিনি সাধু ও চলতি উভয় রীতিরই অনুশীলন প্রথম থেকে করে এসেছেন। এইজন্য তাঁর গদ্যরচনার উভয় রীতির স্বতন্ত্র আলোচনা ছাড়াও, উভয় রীতির পারস্পরিক প্রভাবও আলোচনার বস্তু।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার প্রথম পর্ব ১৮৭৯ (১২৮৬ বৈশাখ) খ্রিষ্টাব্দে ভারতী-তে য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত ; দ্বিতীয় পর্ব এরপর থেকে ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৩০৫ সালের পূর্বপর্যন্ত। তৃতীয় পর্বের সমাপ্তি ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে জীবনস্মৃতি প্রকাশের সঙ্গে এবং চতুর্থ পর্বের শুরু ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ঘরে বাইরে উপন্যাসের প্রকাশ থেকে।

প্রথম পর্ব

যতদূর জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়েছিল জ্ঞানাঙ্কুর-এ, ১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যায় তৎকালে প্রকাশিত তিনখানি গ্রন্থের সমালোচনা। তারপরের বছর ভারতী-তে (১২৮৪ শ্রাবণ-ভাদ্র) প্রকাশিত হয় ভিখারিণী নামে একটি বড়গল্প এবং এই বছরই আশ্বিন থেকে ছাপা হতে থাকে প্রথম উপন্যাস করুণা। পরের বছর ভাদ্র পর্যন্ত সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ছাপা হয়ে করুণা অসমাপ্তরূপেই পরিত্যক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন বিলাতে আর ভারতী-র প্রথম থেকে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় ছয়টি কিস্তিতে প্রকাশিত হয় তাঁর মেঘনাদবধকাব্য প্রবন্ধ। এগুলি ছাড়া ১২৮৫ সালে ভারতী-তে আরও পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গদ্যরচনা।

পরিমাণ যাই হোক, প্রথম পর্বের গদ্যরচনার বিশেষত্বটুকু চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। সেটা এই যে, গল্প-উপন্যাস ও সমালোচনা—উভয়বিধ রচনা নিয়েই গদ্যসাহিত্যে কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ। কল্পনা ও মননের যে দ্বৈতরূপটির সর্বোত্তম ও সর্বাতিশায়ী অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যে পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ করি, তার সূচনা একেবারে প্রথম পর্ব থেকেই। এই বয়সে তাঁর কাছে পরিপুষ্ট ভাব ও ভাষা আশা করা চলে না ; কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভাবের না হোক, ভাষার অপেক্ষাকৃত পুষ্ট রূপটি বিস্ময়োদ্রেক করে। গল্প-উপন্যাসের ভাষার কথাই আগে ধরা যাক।

ভিখারিণী গল্পটির ভাষার সবচেয়ে বড় গুণ তা পূর্বাপর শুদ্ধ সাধু ভাষা। কথোপকথনও সাধু। ভাষার বাঁধুনি আটসাঁট। ভঙ্গিতে কোনো বিশেষত্ব না থাকলেও, তাতে অন্য কারুর অনুকরণের স্পষ্ট চিহ্ন নেই। কল্পনার যত দৈন্যই থাক, ভাষায় শক্তিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন :

> সেই শৈল-শিখরের উপরে, সেই বকুলতরুচ্ছায়ায় মর্মাহত অমর বসিয়া আছেন। এক একটি করিয়া ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে

> পড়িতে লাগিল। কত জ্যোৎস্নারাত্রি, কত অন্ধকার সন্ধ্যা, কত বিমল উষা অস্ফুট স্বপ্নের মত তাঁহার মনে একে একে জাগিতে লাগিল। সেই বাল্যকালের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ধকারময় মরুভূমির তুলনা করিয়া দেখিলেন, সঙ্গী নাই, সহায় নাই, আশ্রয় নাই, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহ তাঁহার মর্মের দুঃখ শুনিয়া মমতা প্রকাশ করিবে না, অনন্ত আকাশে কক্ষচ্ছিন্ন জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায় তরঙ্গাকুল অসীম সমুদ্রের মধ্যে ঝটিকা-তাড়িত একটি ভগ্ন ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায়, একাকী নীরব সংসারে উদাস হইয়া বেড়াইবেন।

উদ্ধৃত অংশটি অবশ্য ভিখারিণী গল্পের সমগ্র ভাষারীতির পরিচয় বহন করে না। এমন স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা রচনার সর্বত্র নেই। কিন্তু এই ধরণের অংশে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষাভঙ্গির নিশ্চিত পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

রচনাকালের ব্যবধান অত্যন্ত সামান্য হলেও করুণা-র ভাষা ভিখারিণী-র তুলনায় অনেক স্বচ্ছন্দগতি এবং সরল ও অনাড়ম্বর। বাক্যগুলি সংক্ষিপ্ত, ক্রিয়াপদের প্রাচুর্যে দ্রুত ধাবমান। যেমন:

> সমস্ত দিন ত কোন প্রকারে কাটিয়া গেল; সন্ধ্যা হইল, পল্লীর কুটীরে কুটীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, পূজার বাড়িতে শঙ্খ-ঘন্টা বাজিতেছে। সমস্ত দিন করুণা তাহার সেই শয্যাতেই পড়িয়া আছে, রাত্রি হইলে পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তঃপুরের সেই বাগানটিতে চলিয়া গেল।

কথ্য শব্দ ও বুলির সুষ্ঠু প্রয়োগে মাঝে মাঝে আশ্চর্য প্রাণবন্ত ভাষার সাক্ষাৎ মেলে। এই যেমন:

> নিধি আসিয়াই মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। ওরে ও—ওরে তা—এ-ঘরে একবার, ও-ঘরে একবার, এটা উল্টাইয়া ওটা পাল্টাইয়া, দুটা একটা বাসন ভাঙ্গিয়া, দুই একটা পুঁথি ছিঁড়িয়া, পাড়াশুদ্ধ তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। কোন কাজই করিতেছেন না অথচ মহা গোল, মহা ব্যস্ত; চটি জুতা চট্ চট্ করিয়া এ-ঘর ও-ঘর, এ-বাড়ি ও-বাড়ি, এ-পাড়া ও-পাড়া করিতেছেন, কোনখানেই দাঁড়াইতেছেন

> না, উর্ধ্বশ্বাসে ইহাকে দু' একটি উহাকে দু' একটি কথা বলিয়া সট্ সট্ করিয়া গুরুমহাশয়ের বাড়ী প্রবেশ করিতেছেন।

করুণা-র কথোপকথনের ভাষাতে সাধু ও চলতির মিশ্রণ ঘটেছে। অশুদ্ধিও আছে, তবে তার পরিমাণ উপেক্ষণীয়। তবু আগের তুলনায় এর ভাষায় তৎসম শব্দ ও ভঙ্গি অত্যন্ত কম এবং সমাসের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। ঘটনার বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে লেখকের নিজের উত্তম পুরুষে উক্তি আছে, কিন্তু প্রচলিত পাঠক-সম্বোধনের রীতিটি অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভঙ্গিটি ইতস্তত সহজেই বিচ্ছিন্নভাবে চোখে পড়ে। যেমন:

> জ্যোৎস্না রাত্রি। ছেলেবেলা করুণা যেখানে দিনরাত্রি খেলা করিয়া বেড়াইত সেই বাগানের ঘাটের উপর সে শুইয়া আছে, অতি ধীরে ধীরে বাতাসটি গায়ে লাগিতেছে। সেই জ্যোৎস্না রাত্রির সঙ্গে, সেই মৃদু-বাতাসটির সঙ্গে, সেই নারিকেল বনটির সঙ্গে তাহার ছেলে-বেলাকার কথা এমন জড়িত ছিল, যেন তাহারা তার ছেলেবেলাকারই একটি অংশ। সেই দিনকার কথাগুলি, শ্মশানে বায়ু-উচ্ছ্বাসের ন্যায় করুণার প্রাণের ভিতর গিয়া হু-হু করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় করুণার বুক ফাটিয়া, বুকের বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া অশ্রুর স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

জ্ঞানাঙ্কুর-এ সমালোচনা প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল পনর বছর ছয় মাস। ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী নামে তিনখানি গ্রন্থের সমালোচনাকে উপলক্ষ করে কিশোর সমালোচক বহু তোড়জোড় করে কলম ধরেছিলেন। জীবনস্মৃতিতে এই সমালোচনা সম্পর্কে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে লিখেছেন: "খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কত।" স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটু তথ্যগত ভুল হয়েছিল, খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য নয়, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করাটাই

দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক একজন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সে লেখকের রচনার কোনও দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাঁহার কোন দোষ দেখাইয়া দেয় সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহারা সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক ভীরু-স্বভাব পাঠক আছেন, যাঁহারা খ্যাতনামা লেখকের রচনা পাঠকালে কোনও দোষ দেখিলে তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে ভয় পান, তাঁহারা মনে করেন এগুলি গুণই হইবে, আমি ইহার গভীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

দ্বিতীয় পর্ব

চলতি গদ্য

দ্বিতীয় পর্বের গদ্যরচনার সূচনা বিলাত যাত্রার পর থেকে। প্রকৃতপক্ষে, এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের পথে প্রকৃত যাত্রা শুরু। এর আগের গদ্যপদ্যসাধনার সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে নস্যাৎ করেছেন, এদের তিনি পরবর্তীকালের প্রকাশ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তিনি সমগ্রভাবে এই পর্ব সম্পর্কে লিখেছেন: "......ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।"

দ্বিতীয় পর্বের গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম আত্মপ্রকাশ চলতি রীতির মাধ্যমে ভারতী-তে প্রকাশিত য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র-গুলিতে। চলতি রীতিকে সাহিত্যের মুখ্য অবলম্বন না করলেও, তিনি নিয়মিত এই পর্বে তার অনুশীলন করেছেন ছিন্নপত্রাবলী-তে, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি-তে। সাহিত্যের মুখ্য বাহন সাধু ভাষা হলেও চলতি ভাষার নিয়মিত প্রায় প্রাত্যহিক চর্চা থেকে এ-কথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে, গদ্যসাধনার একেবারে শুরু থেকেই সাধু ও চলতি উভয় রীতির অনুশীলনই রবীন্দ্রনাথ সমান্তরালভাবে করে এসেছেন। তাঁর উভয় রীতির গদ্যই পারস্পরিক ভাবে প্রভাবিত।

চলতি গদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রায় সমকালেই বিস্ময়কর পরিণতি লাভ করেছিল। এই গদ্যের ভাষা শিক্ষিত বাঙালীর কথ্যভাষার শিষ্ট রূপ। মোটামুটি ভাগীরথীর উভয় কূল, নদীয়ার শান্তিপুর-কৃষ্ণনগরের কথ্যভাষা এই ভাষার ভিত্তি। এই ভাষার জন্মস্থান কলকাতা। সাধু গদ্যের সঙ্গে এই চলতি গদ্যের পার্থক্য কেবল শব্দ ও বুলি বা বাক্‌ভঙ্গিতে নয়, পার্থক্য ধ্বনি ও তালে, সমাপিকা-অসমাপিকা ক্রিয়াপদে, সর্বনামের ব্যবহারে। প্রকৃতি

ও গঠনে দুই ভাষাই স্বতন্ত্র। চলতি ভাষা কথ্যভাষার অত্যন্ত কাছাকাছি, সাধু ভাষা একান্তই দূরগত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল যে আদর্শ সাধু গদ্য সৃষ্টির চেষ্টা, তার কাঠামো বহু শতাব্দীবাহিত বাংলা গদ্যের কাঠামো ; সেই কাঠামোর গদ্যের যে রীতি তা প্রাচীন 'পণ্ডিতী রীতি'। নব্য যুগের উদ্যোক্তারা—বিদেশী শাসক, দেশী ও বিদেশী ধর্মপ্রচারক, শিক্ষাবিদ—ওই কাঠামো ও রীতি নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। একদিন এই পণ্ডিতী বা সাধু রীতি নিশ্চয়ই—যেমন অন্য সব দেশের ভাষা হয়ে থাকে—অনেকখানি কথ্য রীতির কাছাকাছি ছিল। কিন্তু প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যখন থেকে সেই রীতি ও কাঠামোয় খড়-মাটি চাপানো শুরু হয়েছিল, তখনই তা কথ্য রীতি থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে গিয়েছিল, তখনই তা কৃত্রিম হয়ে উঠেছিল। আর এই জন্যই এই রীতি পুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হতে দেরি হয়েছে এতো বেশি। বাংলা গদ্যের অনুশীলনের প্রায় প্রথম থেকেই কথ্য শব্দ ও ভঙ্গির প্রয়োগের কথা অনেকের মনে জেগেছে। কিন্তু মূল গদ্যরীতিকে কথ্য রীতিতে রূপান্তরিত করার কথা কেউ বলেন নি। সাধু সমাজের লোকেরা যে ভাষা 'কহেন ও শুনেন' তাই সাধু ভাষা—রামমোহন এই যে-সাধু ভাষার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন, তা তিনি তাঁর গদ্যে ব্যবহার করেন নি। তাহলে অবশ্যই রীতির পার্থক্য ঘটত, ক্রিয়াপদ, সর্বনামেরও পরিবর্তন ঘটাতে হতো। এখানে 'ভাষা' বলতে রামমোহন মুখ্যত শব্দ ও ভঙ্গির কথাই বলেছেন ; যেমন, আভিধানিক শব্দের পরিবর্তে সাধুসমাজের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শিষ্ট শব্দ, 'সমাসহীন পদে গঠিত ছোট ছোট বাক্যের' প্রয়োগ ইত্যাদি। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'কথোপকথনের ধারায় রচনা' অথবা 'কথোপকথন ও রচনার ধারা পরস্পরের সদৃশ' করার কথা বলেছিলেন, তখন তিনিও 'কথোপকথনের ধারা' বলতে শিষ্ট কথ্য শব্দ এবং ভঙ্গিকেই বুঝিয়েছিলেন। শিষ্ট কথ্য রীতিকে লেখ্য করে তোলার চেষ্টা কেউই করেননি। একেবারে আদি পর্বে উইলিয়ম কেরি তাঁর কথোপকথন (১৮০১) গ্রন্থে দেশীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অনেকগুলি কথোপকথন সংকলন অথবা রচনা করেছিলেন। এই কথোপকথনগুলির ভাষার শব্দ,

ভঙ্গি ও বুলি পুরোপুরি কথ্য—যে অঞ্চলের কথ্য, সেই অঞ্চলের ভাষাই পরবর্তীকালে বাংলা চলতি ভাষার আদর্শ হয়েছে। কিন্তু কেরির কথোপকথনের কাঠামোটি সাধুই। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকা-য় এই ধরনের কথ্য শব্দ ও ভঙ্গিবহুল ভাষার অতি সুন্দর নমুনা আছে।

কেরি ও মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা আলালী ভাষার পূর্বাভাস, সাধু কাঠামোয় যতদূর সম্ভব কথ্য শব্দ ও বুলি কথ্য ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা। শিষ্ট কথ্য রীতি পুরোপুরি প্রয়োগের চেষ্টা সুরু হয় নাটকরচনা ও অভিনয় প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে। অভিনেয় নাটকের সংলাপ কথ্য রীতি ছাড়া সাধু রীতিতে রচিত হলে নাট্যের বাস্তবতা পীড়িত হয়, তাই সেক্ষেত্রে কথ্য রীতি অপরিহার্য। প্রথমদিকে যে বিখ্যাত বাংলা নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল, রামনারায়ণ তর্করত্নের সেই কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪) মুখ্যত এই জন্যই অনাটকীয়। আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থাকারে 'প্রকাশের দেড় বছর পরে রচিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা। অভিনয়ের কথা মনে রেখেই মধুসূদন এই নাটকে হাত দিয়েছিলেন। শর্মিষ্ঠা-ই তাঁর প্রথম বাংলা রচনা এবং সে রচনা সাধু রীতিতে নয়, কথ্য রীতির গদ্যে অর্থাৎ চলতি গদ্যে। প্রথম রচনা বলে স্বভাবতই শর্মিষ্ঠার ভাষার গতি মন্থর, বাক্যযোজনায় মসৃণতার অভাব। কিন্তু ব্যাকরণবিচারে প্রায় শুদ্ধ, বিচিত্র ভাবগুলি বিভিন্ন বাক্‌ভঙ্গিতে পূর্বাপর সুসম্বন্ধ। নাটকের গদ্যসংলাপের অসুবিধা এই যে, তাকে নৈর্ব্যক্তিক হলে চলে না। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার আত্মগত প্রকাশই তার লক্ষ্য। এইজন্য নাটকের সংলাপরচনা দক্ষ ভাষা-শিল্পীর পক্ষেও অপেক্ষাকৃত দুরূহ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ অননুশীলিত কথ্য রীতিতে মধুসূদন প্রথম প্রচেষ্টাতেই কতখানি সার্থকতা অর্জন করেছেন। মধুসূদনের সাফল্যের রহস্য শিল্পী-প্রতিভারই রহস্য। তাঁর নাটকরচনার পিছনে ছিল বিশুদ্ধ শিল্পের প্রেরণা। তাই তাঁর কাছে ভাষার প্রশ্নটি স্বতন্ত্র ছিল না, প্রশ্ন যা ছিল তা মুখ্যত স্টাইলেরই। এবং তিনি সে সম্পর্কে সচেতনও ছিলেন। শর্মিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যে তিনি দ্রুত দুখানি প্রহসন লিখেছিলেন—একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)। এই দুইখানি প্রহসনের সংলাপে তিনি যে ভাষা ব্যবহার

করেছেন তা আজও বাংলা চলতি গদ্যের বিশেষ বাক্‌ভঙ্গির আদর্শ হয়ে আছে।

লক্ষ করার বিষয় এই যে, এই প্রহসন দুটিতে তিনি আঞ্চলিক ভাষার যে প্রয়োগ করেছেন, তার কোথাও অতিরেক ঘটে নি, অর্থাৎ গ্রহণ-বর্জনের পর ভাষার আঞ্চলিকতাকে যতটুকু প্রয়োগ করলে তা ভাষার শিষ্ট রূপের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, ভারসাম্য বজায় থাকে, মধুসূদন তাই করেছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁর সাফল্য কতখানি তা সমসাময়িক দীনবন্ধুর এবং তারও বহুকাল পরের অন্যান্য নাট্যকারদের নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মুখের ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে।

মধুসূদনের পদ্মাবতী (১৮৬০ এপ্রিল) নাটকের ভাষা শর্মিষ্ঠা-র চেয়ে অনেক বেশী মসৃণ। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার যে পদ্মাবতী রচনার সময়েই তিনি প্রথম তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল রহস্য—শ্বাস-যতি থেকে অর্থ-যতিকে পৃথক করার অর্থাৎ বাক্যছন্দের ব্যাপারটি—ধরতে পেরেছিলেন। মধুসূদনের চলতি ভাষার পরিপূর্ণ রূপ ধরা পড়েছে তাঁর মায়াকানন নাটকে।

মধুসূদনের হাতে (দীনবন্ধুকেও অবশ্য এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে) চলতি ভাষার অসাধারণ উন্নতি হলেও তা নিছক নাটকের সংলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্ণনাত্মক পরোক্ষ উক্তির একটি বাক্যও তিনি লেখেন নি, এমন কি নাটকের মধ্যে সংলাপবহির্ভূত যে ক্রিয়ার নির্দেশ, তাও লিখেছেন সাধু ভাষায়। তিনি বর্ণনাত্মক চলতি ভাষায় লিখলে কেমন সাফল্য অর্জন করতেন তা জানি না, তবে এই সময় সম্পূর্ণ চলতি ভাষায় বর্ণনাত্মক রচনায় হাত দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোম প্যাঁচার নকশা-য় (১৮৬১-৬২)। তিনিই প্রথম ধারাবাহিক রচনায় আদ্যন্ত ব্যাকরণবিশুদ্ধ চলতি ভাষার ব্যবহার করেন। তাঁর ভাষার ত্রুটি হচ্ছে কথ্য ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী বানান এবং খাস কলকাতাই কথ্যের কিছু কিছু শব্দ, ক্রিয়াপদ ও প্রত্যয়ের ব্যবহার। চলতি ভাষা যে-কথ্য ভাষার শিষ্ট রূপ তা কলকাতা ও ভাগীরথী অঞ্চলের কথ্য ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষিত বাঙালীর কথ্য ভাষা। চলতি ভাষা অর্থাৎ শিষ্ট কথ্য ভাষার লিখিত রূপের কাছে কলকাতাই ভাষা বা ভাগীরথী অঞ্চলের কথ্য ভাষা উপভাষা বা ডায়ালেক্ট। এই উপভাষা বা ডায়ালেক্ট

যার মাতৃভাষা তার ক্ষেত্রে এই ভাষায় রচনা করতে গেলে মৌখিক উপভাষার শব্দ, ক্রিয়াপদ ও প্রত্যয় বেশি পরিমাণে ঢোকাই স্বাভাবিক। কালীপ্রসন্নের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এটি অবশ্যই ত্রুটি, কিন্তু গুরুতর ত্রুটি নয়। কারণ, উপভাষিক শব্দগুলি বিশিষ্ট বিষয়বস্তুর জন্য অনেকখানি খাপ খেয়ে গিয়েছে। মধুসূদন তাঁর প্রহসনগুলির ভাষায় যে এতো সার্থকতা অর্জন করেছিলেন, সম্ভবত তার কারণ, তিনি কলকাতার বা ভাগীরথী অঞ্চলের লোক ছিলেন না।

হুতোম প্যাঁচার নকশা-র বিষয়বস্তু গুরুতর নয়, সুতরাং তার ভাষায় গুরুগাম্ভীর্য আশা করা অনুচিত। এর ভাষা বক্তব্যের অনুযায়ী যথার্থ ভাষা। এই ভাষা নিছক ভাষার আদর্শের নিদর্শন নয়, এ ভাষা শিল্পী কালীপ্রসন্নের স্টাইলের নিদর্শন। কালীপ্রসন্ন সোজাসুজি চলতি ভাষাকেই রস-সাহিত্যের বাহন করেছেন। তাঁর নকশা অবশ্যই রসগোত্রের সাহিত্য। নকশার ভাষা দেখে এই কথাই মনে হয় যে তিনি যদি আরও কিছুদিন বাঁচতেন এবং এই ভাষার চর্চা করতেন, তাহলে বাংলা চলতি গদ্যের ইতিহাস হয়ত অনেকটা অন্যরকম হতো। এই চলতি ভাষা যে গুরুতর ভাব বা সকল রকম গম্ভীর চিন্তাকে প্রকাশ অথবা ধারণ করতে সক্ষম তার নমুনা নকশায় অপ্রতুল নয়।

হুতোমী রীতি বিদগ্ধ সমাজে তিরস্কৃত হলেও চলতি ভাষার অনুশীলনের ধারা লুপ্ত হয়নি। হুতোম প্যাঁচার নকশা-র সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় আপনার মুখ আপনি দেখ লিখেছিলেন। তার প্রায় তিন বছর পর ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন সমাজ কুচিত্র নামে একখানি নকশা। ভুবনচন্দ্রের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, তিনি সেই যুগে চলতি ভাষায় আটশো-সত্তর পৃষ্ঠার একখানি অতিবৃহৎ উপন্যাস লিখেছিলেন। বাংলা চলতি গদ্যের ইতিহাসে এটি একটি স্মারক চিহ্ন। কিন্তু হুতোম প্যাঁচার নকশা-র মতো ভুবনচন্দ্রের এই উপন্যাস শিক্ষিত মহলে আলোড়ন তুলতে পারে নি। তার কারণ, অসাধারণ জনপ্রিয় হলেও তার পাঠক ছিল অর্ধশিক্ষিত সমাজ ও অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ। আক্ষরিকভাবে গুপ্তপথে না হোক, শিক্ষিত সমাজের সচেতন উপেক্ষার অন্তরালে বটতলার রহস্য-গল্পসাহিত্যের প্রায় অপ্রকাশ্য

পথেই এই উপন্যাসের—যার নাম হরিদাসের গুপ্তকথা—গতিবিধি ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'খাতা' গল্পে উল্লেখ পাই: "তাহার বউঠাকুরানীর বলিশের নীচে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ছিল, সেটা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া আনিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেনসিল দিয়া লিখিয়াছে"—ভাষার ক্ষেত্রে তার কোন প্রভাব ফেলার উপায় ছিল না। হুতোম প্যাঁচার নকশা-কে বংকিমচন্দ্র ছাড়পত্র দিতে সম্পূর্ণ নারাজ হলেও, তার গুরুত্ব তিনি পুরোপুরি স্বীকার করেছিলেন। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে প্রবন্ধটি কালকাটা রিভিউ-তে লিখেছিলেন, তার ক্ষুদ্র আয়তনে সবচেয়ে বেশি নিদর্শন-উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন হুতোম প্যাঁচার নকশা-র। যেখানে আলালের ঘরের দুলাল থেকে উদ্ধৃতি মাত্র সাতাশ লাইন, সেখানে নকশার উদ্ধৃতি আশি লাইন। তিনি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন হুতোমের নকশা প্রকাশের নয় বছর পর। তারও প্রায় সাত বছর পরে লেখা হয় বঙ্গদর্শন-এর বাঙ্গালা ভাষা প্রবন্ধটি। স্পষ্টতই, এই কয় বছরে হুতোমী রীতি বা চলতি রীতি সম্পর্কে তাঁর বিরাগ আরও দৃঢ় হয়েছিল। তিনি যে সমন্বিত ভাষার কথা বলেছিলেন তা সাধু রীতিরই রূপভেদ, চলতি রীতিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন।

কিন্তু বংকিমচন্দ্র যখন এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার ঠিক এক বছরের মধ্যেই ভারতী পত্রিকায় কিশোর রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষায় লেখা য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র (১২৮৬, বৈশাখ) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১২৮৮ (ইং ১৮৮১) সালে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এইটিই তাঁর প্রথম গদ্য গ্রন্থ। হুতোম প্যাঁচার নকশা বা ভুবনচন্দ্রের হরিদাসের গুপ্তকথা নয়, কিশোর রবীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থই চলতি ভাষারীতিকে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশের অধিকার আদায় করে দিয়েছে। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রগুচ্ছ পত্র হলেও সাধারণ অর্থে পত্র নয়। এদের মধ্যে বিবরণ ও বর্ণনার এমন একটা দূরত্ব আছে, যার ফলে পত্রলেখকের ব্যক্তিগত ভঙ্গি প্রকটিত হলেও এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। এই পত্রগুলি যাঁর উদ্দেশ্যে লেখা তিনি উপলক্ষ মাত্র, প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে পাঠক সাধারণ। তাই পত্র হয়েও এগুলি মুখ্যত বর্ণনামূলক ভ্রমণকাহিনী।

এই পত্রগুলিতে রবীন্দ্রনাথ কেন চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে ভূমিকায় লিখেছেন: "...আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিৎ সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজনের সহিত মুখোমুখি একপ্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া মনে হয়।" সাধু ভাষায় লেখা চলতি ভাষার স্বপক্ষে এই কৈফিয়তের পেছনে বিজ্ঞতার পরিচয় যত না আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী আছে বয়ঃসন্ধির চমকলাগানো বিজ্ঞম্মন্যতা। সর্বোপরি এর পেছনে আছে অভ্যস্ত ও প্রচলিত পথকে অস্বীকার করে নতুন পথে পা-বাড়ানোর তারুণ্য সুলভ দুঃসাহস। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, প্রথম প্রচেষ্টাতেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্যবেধ করেছেন। হুতোম যা পারেন নি, ভুবনচন্দ্রের যা সাধ্য ছিল না, রবীন্দ্রনাথ তাতেই অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছেন, শিষ্ট চলতি ভাষার আদর্শটি অবলীলাক্রমে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। কলম ধরেই তিনি লিখলেন:

> একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে-করতে আমাদের জাহাজ একলা চলেছে; যেখানে চাই সেইদিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে—সে এক মহাগম্ভীর দৃশ্য।

চলতি ভাষার এই যে রূপ, এইটিই সাহিত্যে ব্যবহৃত শিষ্ট চলতি ভাষার স্ট্যাণ্ডার্ড রূপ হিসাবে পরবর্তী কালে স্বীকৃত। এখানে ভারী তৎসম শব্দগুলি চলতি ক্রিয়াপদের শ্বাসঘাতমূলক তালের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে খাপ খেয়ে সমতা লাভ করেছে। চলতি ভাষার রহস্য যে কেবলমাত্র চলতি শব্দগুলির মধ্যে নেই, তা আছে মুখ্যত তার তালের বিশিষ্টতার মধ্যে, যা মূলত সাধু শব্দের তাল থেকে স্বতন্ত্র, যার ফলে তার বাক্যচ্ছন্দ সাধুভাষার ছন্দ থেকে পৃথক হয়—রবীন্দ্রনাথ শুধু এইটি বোঝেন নি, তার অতিসুন্দর প্রয়োগও করেছেন। বিলিতি নাচের বর্ণনা দিচ্ছেন:

নাচ আরম্ভ হল। ঘুর-ঘুর-ঘুর। একটা ঘরে, মনে করো, চল্লিশ পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে; ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, কখনো জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি। তবু ঘুর-ঘুর-ঘুর। তালে তালে বাজনা বাজছে, তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠছে। একটা নাচ শেষ হল। বাজনা শেষ হল; নর্তকমহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফলমূল মিষ্টান্ন, মদিরার অয়োজন; হয়তো আহার-পান করলেন, না-হয় দুজনে নিভৃতকুঞ্জে বসে রহস্যালাপ করতে লাগলেন।—তৃতীয় পত্র।

ছন্দে তালে, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে এখানে ভাষার যে নৃত্যপর মূর্তি, তা দেখে একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে এভাষা লেখকের প্রথম প্রচেষ্টার ফল। এখানে ভাষা ভঙ্গিকে ছাড়িয়ে স্টাইলে পরিণত হয়েছে। যেহেতু য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-তে কিশোর মন ও দৃষ্টি অপরিণত, সেই হেতু ভাষার স্টাইলও তরল, সামগ্রিক-ভাবে শিথিলবদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাণবান ও মার্জিত শ্রীসম্পন্ন।

চলতি ভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই বিস্ময়কর সাফল্যের মূলে আছে ভাষার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং শিল্পীসুলভ সামঞ্জস্যবোধ। কথ্য ভাষা থেকে উপভাষার কোন ধরনের শব্দ ও বুলিকে বাদ দিলে তা শিষ্ট চলতি ভাষার স্ট্যাণ্ডার্ড হতে পারে, এই বোধটি তাঁর প্রখর ছিল, যার অভাব ছিল হুতোমের। উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদে 'লেম' প্রত্যয়ে গঠিত শব্দ ছাড়া কোনো উপভাষিক শব্দ তিনি ব্যবহার করেন নি। শিষ্ট চলতি ভাষার লিখিত রূপের কোনো অনুসরণযোগ্য আদর্শ তাঁর সামনে ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি যে অনায়াসে এই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিলেন, মনে হয়, তার পেছনে ঠাকুরবাড়ীর পরিশীলিত ঘরোয়া কথ্য ভাষার প্রভাব অনেকখানি কাজ করেছিল; শিষ্ট চলতি ভাষার আদর্শটি তাঁর হাতের কাছেই ছিল, তাই তিনি তাকে সহজে লিখিত রূপ দিতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই নিয়মিত চলতি ভাষার অনুশীলন করেছেন তাঁর চিঠিপত্রে। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দশ বছরের পত্র সংকলিত আছে তাঁর ছিন্নপত্র, গ্রন্থে। ছিন্নপত্র-এর পত্রগুলিই য়ুরোপ-প্রবাসীর

পত্র গ্রন্থের পর তাঁর চলতি গদ্যের নিদর্শন। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রগুলি থেকে এই পত্রগুলির পার্থক্য এইখানে যে, এগুলি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, প্রকাশের উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। সুতরাং দশজনের সামনে হাজির করার প্রয়োজনে এগুলির মাজাঘসার কোনো তাগিদ ছিল না। এগুলির মধ্যে তাই তাঁর প্রকাশপটু চলতি ভাষার সহজতম রূপেরই পরিচয় পাই। কর্মমুখর প্রতিদিনের জীবনযাত্রার দায়-দায়িত্ব মেটানোর, কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণের ফাঁকে ফাঁকে লেখা এই পত্রগুলিতে যেমন বিচিত্র বস্তু ও চিন্তার অবতারণা, ভাষার ভঙ্গিতেও তেমনি স্বাভাবিকভাবেই বৈচিত্র্যের আস্বাদ। ভাষা কখনো বা লঘুদেহ দ্রুতগতি, কখনো বা ধীর মন্থর ভারাক্রান্ত, আবার তারপরেই তরল গতিচ্ছন্দে উচ্ছল চলতি ভাষার বিচিত্র মূর্তি।

ছিন্নপত্র-এর মধ্যবর্তী কালের চলতি গদ্যরচনা য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি-র দুইটি খণ্ড। দ্বিতীয়বার বিলেত ঘুরে এসে ১৮৯১ (বৈশাখ ১২৯৮) ও ১৮৯৩ (আশ্বিন ১৩০০) খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ডায়ারি অবলম্বনে এই দুই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ও এই দুই গ্রন্থের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান দশ-বারো বছর। এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন কাব্যের ক্ষেত্রে মানসী-সোনার তরী-র যুগে এসেছেন, সাধু গদ্যের ক্ষেত্রেও তেমনি বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর সাধু গদ্যের রীতি বিচিত্র বিষয়ের আলোচনায়, বিচিত্র ভঙ্গির অনুশীলনে পরিণত হয়ে উঠেছিল। সাধু গদ্যের চেয়ে চলতি গদ্যের অনুশীলনের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর চলতি গদ্য এই সময়ের সাধু গদ্যের চেয়েও পরিণত রূপ লাভ করেছিল। এই সময়ের বর্ণনাভঙ্গি তাই য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এর ভঙ্গি থেকে অনেকাংশে পৃথক। এখন আর সেই বয়ঃসন্ধিকালের বহির্মুখী চঞ্চল কৌতূহলী মন নেই, তার বদলে সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতিসম্পন্ন, বিস্ময়ের ঘোর-লাগা মধ্যযৌবনের অন্তর্মুখী মন। তাই চলতি ভাষায় বেগবত্তার সঙ্গে মিশেছে সান্দ্র মন্থরতা, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দীর্ঘায়িত গতিচ্ছন্দ। যেমন আর একটি নাচের বর্ণনা:

সকলে মিলে জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণিনৃত্য আরম্ভ হল। তখন পূর্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে সমুদ্রশয়ন থেকে উঠে আসছে।

M31245

এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্বসীমান্তে উদয়পথের ঠিক নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিকমিক করছে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন এক অলৌকিক বৃন্তের উপরে অপূর্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মতো আপন প্রশান্ত সৌন্দর্যে নিঃশব্দে চতুর্দিকে দল প্রসারণ করলে। আর মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ধরে পাগলের মতো তীব্র আমোদে ঘুরপাক খাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে, উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এর নাচের বর্ণনার ভাষা থেকে এ ভাষার প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। চলতি ভাষার এ আর এক রূপ। তবুও য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি-তে ভাষার পরিপূর্ণ স্ফূর্তি ঘটে নি। ডায়ারিতে চিন্তাভাবনা ও দৃশ্যগুলির মধ্যকার ঐক্যসূত্রটি শিথিল, এই জন্যই ভাষায় অখণ্ড শ্রী ফুটে ওঠে নি, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-দীপ্তির মতো তা ঝলকে ওঠে মাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এ ভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো সন্দেহই জাগে না। চলতি ভাষায় যে কতখানি গভীরতা প্রকাশ করা যায়, কত সুন্দর রসোজ্জ্বল দৃশ্য আঁকা যায়, কী প্রবল গতিবেগ সঞ্চার করা যায়, তার প্রমাণ এই যুগের ছিন্নপত্র-এর একেবারে শেষদিকে আছে। যেমন :

> কাল অনেকদিন পরে সূর্যাস্তের পর, ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা-হা করছে—কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা। কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত সহস্র গ্রাম নদী পর্বত প্রান্তর নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে? কোন অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ।

সাধু গদ্য

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিকের সাধু গদ্যের ধারাবাহিক রচনা বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাস। ১২৮৮ সালের কার্তিক থেকে পরের বছর আশ্বিন পর্যন্ত এটি ভারতী-তে প্রকাশিত হয়। বউঠাকুরানীর হাট-এর ভাষা পরিচ্ছন্ন ও সরল। সূচনাটি এই রকম :

> রাত্রি হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না। যশোহরের যুবরাজ, প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র, উদয়াদিত্য তাঁহার শয়নগৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী সুরমা।

সরল বাক্যপ্রয়োগের এই পদ্ধতিটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারই বিশেষত্ব, তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি। এই পদ্ধতি মূলত উপন্যাসে সমগ্রভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তবু এই উপন্যাসের ভাষাকে মুখ্যত এই পদ্ধতির অনুকরণ বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব সরল বাক্যের প্রতি থাকলেও, তা অতি-সংক্ষিপ্ত কাটাকাটা সরল বাক্য নয়। তাঁর সরল বাক্যগুলি দীর্ঘায়িত, বাক্যপরম্পরায় ক্রিয়ার কালগুলি অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র, বহুক্ষেত্রে যৌগিক বাক্যগুলি সংযোজক অব্যয়পদের অনুপস্থিতিতে সরল বাক্যের সমষ্টি মাত্র। অনুচ্ছেদে সাধারণভাবে অসমাপিকা ক্রিয়াপদযুক্ত সরল বাক্যের সংখ্যাই বেশি। আবার অন্তর্মুখী বর্ণনায় তাঁর পক্ষপাতিত্ব জটিল ও মিশ্র বাক্যের প্রতি। বাক্যগঠনের এই মিশ্র পদ্ধতিকেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বলা চলে এবং এই পদ্ধতিই পরবর্তী কালে তাঁর সাধু গদ্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই বাক্যগঠনপদ্ধতির মূলে আছে ছন্দ-স্পন্দের বিশেষত্ব। সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যের ছন্দের স্পন্দ বা তালের মধ্যে ওঠানামা কম, যা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘায়িত সরল বাক্যে অনেক বেশি। তুলনা দিলে বলতে হয়, আগেরটি মাটির উপরে দৃঢ় পদক্ষেপে চলার স্বচ্ছন্দগতি, পরেরটি নদীর স্রোতে

ঢেউয়ের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে সাবলীল প্রবহমানতা। এই বিশেষত্ব বউঠাকুরানীর হাট-এর ভাষায় দুর্নিরীক্ষ নয়। যেমন :

> কিন্তু যখন সেই রাত্রে নিদ্রা ভাঙিয়া সহসা তিনি দেখিলেন, বিভা শয্যায় বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, তাহার অর্ধ-অনাবৃত বক্ষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মধুর করুণ দুটি চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে, তাহার ক্ষুদ্র দুটি অধর কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিতেছে, তখন তাঁহার মনে সহসা একটা কী উচ্ছ্বাস হইল, বিভার মাথা কোলে রাখিলেন, চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বিভার করুণ অধর চুম্বন করিবার জন্য হৃদয়ে একটা আবেগ উপস্থিত হইল, তখনই প্রথম তাঁহার শরীরে মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল, তখনই প্রথম তিনি বিভার নববিকশিত যৌবনের লাবণ্যরাশি দেখিতে পাইলেন, সেই সময় তাঁহার নিঃশ্বাস বেগে বহিল, অর্ধ-নিমীলিত নেত্রপল্লবে জলের রেখা দেখা দিল, হৃদয় বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। বিভাকে চুম্বন করিতে গেলেন।

উদ্ধৃত অংশটি দৃশ্যত দুটি বাক্যের হলেও, প্রথম বাক্যটি প্রকৃত পক্ষে একটি জটিল ও তেরোটি সরল বাক্যের সমষ্টি। সংযোজক অব্যয় ও পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার না করায় মিশ্র আকার ধারণ করেছে। আপাত-দৃষ্টিতে এখানে যে ব্যাকরণগত ত্রুটি তা অনবধানতা বশত নয়। এখানে বাক্যগঠনরীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ভাষার তরঙ্গায়িত দ্রুত প্রবাহিত গতিচ্ছন্দ। আবার পূর্ণচ্ছেদহীন চৌদ্দটি বাক্যের একটানা প্রবাহপথের পর অকস্মাৎ চারটি পদের একটি সরল বাক্যে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়াতে একধরনের বৈচিত্র্যও সৃষ্টি হয়েছে। বৈচিত্র্যসৃষ্টির এই কৌশলটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বাক্যপ্রয়োগ পদ্ধতির অন্তর্ভূত।

বউঠাকুরানীর হাট-এর সমকালের এবং কিছু আগের ও পরের রচনা অনেকগুলি প্রবন্ধ। বিলাত থেকে ফিরেই সংগীত সম্পর্কে তিনি তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, আর লিখেছিলেন বিচিত্র বিষয় ও বিচিত্র মানসিকতা সম্পৃক্ত ছোটবড় অনেক প্রবন্ধ। এইসব প্রবন্ধ বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩),

আলোচনা (১৮৮৫), সমালোচনা (১৮৮৮) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে এমন দু-একটি আছে, রবীন্দ্রনাথের অতিপরিণত যুগের ভাব ও ভাষার নমুনা হিসাবে যাদের স্বচ্ছন্দে উপস্থিত করা যায়। যেমন :

> প্রভাতে আমি হারাইয়া যাই, সন্ধ্যাকালে আমি ব্যতীত বাকী আর সমস্তই হারাইয়া যায়। প্রভাতের আমি শত সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজন; তখন জগতের যন্ত্রের কাজ আমি সমস্তই দেখিতে পাই; বুঝিতে পারি আমিও সেই যন্ত্র-চালিত একটি জীবমাত্র; যে মহানিয়মে সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, জনকোলাহল জাগিয়াছে, আমিও সেই নিয়মে জাগিয়াছি, কার্যক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতেছি; আমিও কোলাহলসমুদ্রের একটি তরঙ্গ, চারিদিকে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ যে নিয়মে উঠিতেছে, পড়িতেছে, আমিও সেই নিয়মে উঠিতেছি পড়িতেছি। সন্ধ্যাকালে জগতের কল-কারখানা দেখিতে পাই না, এইজন্য নিজেকে জগতের অধীন বলিয়া মনে হয় না; মনে হয় আমি স্বতন্ত্র, মনে হয় আমিই জগৎ।—প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল।

এই সময়কার বস্তুবিচারমূলক ও ভাবুকতাময় বা আত্মভাবনামূলক উভয়-বিধ প্রবন্ধেই ভাষা ও ভঙ্গির প্রয়োগগত ক্রমিক নৈপুণ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে যেমন যুক্তিশৃঙ্খলা বিস্তারের চেষ্টা, শ্লেষব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ প্রয়োগের প্রয়াস অথবা বস্তুনির্ভরতা, অন্যদিকে তেমনি সূক্ষ্ম অনুভূতিময় কবিত্বমধুর অথবা প্রগাঢ় দার্শনিক মানসিকতাকে শব্দে অর্থে আকারদানের আকাঙ্ক্ষা। এই বিষয়ভেদের জন্য ভাষার যে ভঙ্গিভেদ, তার নমুনা সংগীত ও কবিতা শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে দিচ্ছি :

> সচরাচর কথোপকথনে যুক্তির যতটুকু আবশ্যক, তাহারই চূড়ান্ত আবশ্যক দর্শনে বিজ্ঞানে। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানের গদ্য কথোপকথনের গদ্য হইতে অনেক তফাত। কথোপকথনের গদ্যে দর্শন বিজ্ঞান লিখিতে গেলে যুক্তির বাঁধুনি আলগা হইয়া যায়। এই নিমিত্ত খাঁটি নিভাঁজ যুক্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার চুলচেরা তীক্ষ্ণ পরিষ্কার ভাষা নির্মাণ করিতে হয়। কিন্তু তথাপি

Jangipur College Library
4552
Acc. No. 4552
Date 7/4/15
Call No. 891.44301/SAN

সে ভাষা গদ্য বই আর কিছু নয়। কারণ যুক্তির ভাষাই নিরলঙ্কার সরল পরিষ্কার গদ্য।

এ ভাষা যুক্তির ভাষা, যুক্তি প্রতিষ্ঠার ভাষা। এর ঋজুতা ও স্পষ্টতা কথ্য বুলি ও শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহারে। 'এই নিমিত্ত' 'কিন্তু তথাপি' ইত্যাদি দু-একটিকে বাদ দিলে এমন স্বচ্ছ সরল ও তীক্ষ্ণ সাধু গদ্যরচনা অসাধারণ শক্তির পরিচয় বহন করে। যেখানে মানসিকতায় দার্শনিকতার গাঢ় প্রলেপ, সেখানেও এই স্বচ্ছ সরল সাধু গদ্যের সুন্দর প্রয়োগও বিশেষভাবে চোখে পড়ে। যেমন :

> শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের নাম ভুলিতে পারে না। উহা কানের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মর্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি সৌন্দর্য মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মত পড়ে।—স্বর্গের গান।

এখানে স্বভাবতই ভাষাভঙ্গিটি গম্ভীর এবং অলংকার ও ব্যঞ্জনাবহুল। আবার একই সময়ে নিছক তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভাষায় সাধু ভঙ্গির প্রাধান্য। যেমন :

> কত অসংখ্য কত বিচিত্র জগৎ আছে, তাহা একবার মনোযোগ-পূর্বক ভাবিয়া দেখা হউক দেখি! আমার কথা হয়ত অনেকে ভুল বুঝিতেছেন। অনেকে হয়ত চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র একটি একটি গণনা করিয়া জগতের সংখ্যা নিরূপণ করিতেছেন। কিন্তু আমি আর একদিক হইতে গণনা করিতেছি। জগৎ একটি বই নয়। কিন্তু প্রতি লোকের এক একটি পৃথক্ জগৎ আছে, তাহাই গণনা করিয়া দেখ দেখি! কত সহস্র জগৎ!—জগতের জন্মমৃত্যু।

১২৯১ সালের প্রথমেই (এপ্রিল ১৮৮৪) কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন, তাতে যেমন তাঁর রূপমুগ্ধ

চঞ্চল মন বহির্মুখিতা ত্যাগ করে বেদনার গভীরতায় আত্মস্থ হয়েছিল, অকস্মাৎ যৌবনের প্রারম্ভেই জীবনবোধের প্রৌঢ়প্রাজ্ঞতা লাভ করেছিল; ভাষার ক্ষেত্রেও তেমনি স্বাভাবিকভাবেই আগের ভঙ্গি ও রীতির অস্থৈর্য ও শৈথিল্য দূর হয়ে এক অনুভূতিদীপ্ত, চেতনাগাঢ়, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় রূপ ফুটে উঠেছিল। বাক্যগঠনপদ্ধতিতে, শব্দপ্রয়োগে, অনুচ্ছেদরচনায়—এক কথায় রচনার কলাবিধিতে অকস্মাৎ যেন প্রৌঢ়ত্বের স্পর্শ লেগেছিল। বস্তুত, ভাষার যে যে বৈশিষ্ট্যকে প্রকৃত রাবীন্দ্রিক বলা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই এই সময়ে পূর্ণ প্রকটিত হয়ে উঠেছিল।

ঘটনাটি যদিও ১২৯১ সালের, কিন্তু এই রূপান্তরণের পরিচয় মেলে এক বছর পরের রচনা থেকে। বেদনার আঘাতকে গূঢ়চারী অন্তরপ্রেরণায় পরিণত করতে কিছুটা সময় লেগেছিল। এই সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রথম রচনা পুষ্পাঞ্জলি। এটি ছাপা হয় ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসের ভারতী-তে। পুষ্পাঞ্জলি-কে গদ্যকবিতাগুচ্ছ বলাই সঙ্গত। কারণ, এখানে শোকের আতিশয্য ও উচ্ছ্বাস গদ্যের অসম তালের ছন্দে ধরা পড়েছে। এমন চূড়ান্তভাবে আত্মমুখী গদ্যরচনা রবীন্দ্রনাথ আগে করেন নি, যেন সাধু গদ্যে লেখা গীতিকবিতা। যেমন :

> ....আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত;—আমাকে কত প্রভাতে কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায়, সে দেখিয়াছে। কত বসন্তে, কত বর্ষায়, কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শত সহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে। যে-আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধূলা, সতেরো বৎসরের সুখদুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্তবর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধূলা হইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর কেহ জানিত না, জানে না।

পুষ্পাঞ্জলি-র এই ভাষাভঙ্গির পরিণত সমৃদ্ধ রূপ ধরা পড়েছে রুদ্ধগৃহে,

পথপ্রান্তে প্রবন্ধ দুটিতে। এই ভঙ্গি থেকেই মূলত বিষয়ভেদে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যক্তিক প্রবন্ধের (personal essay) সৃষ্টি। তার সুন্দর নিদর্শন লাইব্রেরি প্রবন্ধটি। এখানে ভাষায় ভঙ্গিতে ও অলংকারে বক্তব্যটুকু নিঃশেষে প্রকাশিত। যেমন :

> শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছ। এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।
>
> কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো, এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।

কেবলমাত্র অন্তর্মুখিতা ও রচনাগাঢ়তা নয়, বাহুল্যবর্জিত একমুখী সারল্যও এযুগের রচনার অন্যতম গুণ। এই গুণ সবচেয়ে চোখে পড়ে মুকুট গল্পে, ছোটনাগপুর ভ্রমণ বর্ণনায়, রাজর্ষি উপন্যাসে। প্রবহমান ভঙ্গিতে ঘটনার দ্রুত তালে ভাষায় যেন পালতোলা নৌকার মতো নিরঙ্কুশ, নিরবচ্ছিন্ন গতি। অবশ্য এই লক্ষণ কিছু আগেই সরোজিনী-প্রয়াণ, ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা গল্প তিনটিতে দেখা দিয়েছে। আত্মস্থ মন এই সময়ে যেন নতুন করে চোখ মেলে বহির্জগতকে নতুন করে দেখছে। বাহুল্যবর্জিত বহির্দৃশ্যের বর্ণনা যেমন :

> ....জাগিয়া উঠিয়া দেখি, বামে ঘনপত্রময় বন। গাছে গাছে লতা, ভূমি নানাবিধ গুল্মে আচ্ছন্ন। বনের মাথার উপর দিয়া দূর পাহাড়ের নীল শিখর দেখা যাইতেছে। মস্ত মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক-একটা গাছ। তাহাদের ক্ষুধিত শিকড়গুলো দীর্ঘ হইয়া চারি দিক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাথরখানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া খাদ্য আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামে জঙ্গল কোথায় গেল। সুদূর-বিস্তৃত মাঠ। দূরে গোরু চরিতেছে, তাহাদিগকে ছাগলের মতো ছোটো ছোটো দেখাইতেছে। মহিষ কিম্বা গোরুর কাঁধে লাঙল দিয়া পশুর লাঙ্গুল মলিয়া, চাষারা চাষ করিতেছে। চষা মাঠ বামে পাহাড়ের উপর সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে।
> —ছোটনাগপুর।

মুকুট ও রাজর্ষি উভয়ের ভাষা ও ভঙ্গির সরলতা অনেকখানি সচেতন। কারণ, রবীন্দ্রনাথ এই গল্প ও উপন্যাস দুটি বালক পত্রিকায় বালক-বালিকাদের জন্য লিখেছিলেন। অতি সংক্ষিপ্ত একাদশ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্টে বিভক্ত মুকুট ছাপা হয়েছিল বালক-এর (১২৯১) বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, আর রাজর্ষি উপন্যাস সুরু হয়েছিল আষাঢ় সংখ্যা থেকে; ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ ছাপা হয়েছিল ১২৯৩ সালের মাঘ মাসে (১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭)। মুকুট ও রাজর্ষি-র কথোপকথন সাধু ভাষায় লেখা। মুকুট-এর কথোপকথনে মিশ্রণ নেই, কিন্তু রাজর্ষি-তে সামান্য আছে। বস্তুনিষ্ঠ দৃশ্যবর্ণনার যে সাক্ষাৎ রাজর্ষি-তে মেলে, তার পরিচয় ছোটনাগপুর ভ্রমণকথায় (আষাঢ় ১২৯২) আগেই পেয়েছি। রাজর্ষি-র সরল ভাষার শক্তিমত্তার নিদর্শন দিই :

> অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মতো আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও!"
>
> নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—সেই মুহূর্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নিচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই। কেবল সেই "দাঁড়াও" শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন

গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল—সেই "দাঁড়াও" শব্দ যেন তড়িৎ প্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল ; অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতোই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজর্ষি-র পর রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন দীর্ঘ গদ্যরচনায় হাত দেন নি। তবে বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এযুগের সমস্ত লেখাতেই পূর্বাপর ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতা বর্তমান। যেমন শব্দতত্ত্বের আলোচনায় বাংলা উচ্চারণ প্রবন্ধের ভাষা :

> পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের বাংলা-অক্ষর উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই। কেবল তিনটে স, দুটো ন ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্বে পণ্ডিতমশায় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, "দেখো বাপু, 'সুশীতল সমীরণ' লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিয়ো 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।" এছাড়া দুটো ব-এর মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋ ৯ ঙ ঞ-গুলো কেবল সং সাজিয়া আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘহ্রস্ব স্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক্‌ না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনো অনিয়ম নাই, এইরূপ আমার ধারণা ছিল।

এই সময়ে তিনি একই সঙ্গে সরস ভঙ্গিতে গুরুতর বিষয় নিয়ে রচনা সুরু করেছিলেন। বিরুদ্ধবাদীর প্রতি কৌতুক ও সরস বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করা রবীন্দ্রনাথের একশ্রেণীর রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি,—সেক্ষেত্রে গুরুতর বিষয়ও ভঙ্গির লঘুতায় উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের রচনা রসিকতার ফলাফল ভারতী-তে একই সংখ্যায় পুষ্পাঞ্জলি-র সঙ্গে বেরিয়েছিল। এই ভঙ্গিই মূলত অনুসৃত হয়েছে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে বালক পত্রিকায় প্রকাশিত 'চিরঞ্জীবেষু' ও 'শ্রীচরণেষু' নামে ছদ্ম-পত্র-রচনাগুলিতে। যেমন :

> ভায়া, আমাদের সেকালে পোস্টাপিসের বাহুল্য ছিল না—জরুরি কাজের চিঠি ছাড়া অন্য কোনো প্রকার চিঠি হাতে আসিত না, এইজন্য সংক্ষেপে চিঠি পড়াই আমাদের অভ্যাস। তা-ছাড়া বুড়া মানুষ—প্রত্যেক অক্ষর বানান করিয়া করিয়া পড়িতে হয়—বড়ো চিঠি পড়িতে ডরাই সে কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তোমার চিঠি পড়িয়া দীর্ঘ পত্র পড়ার দুঃখ আমার সমস্ত দূর হইল। তুমি যে হৃদয়পূর্ণ চিঠি লিখিয়াছ তাহার সমালোচনা করিতে বসিতে আমার মন সরিতেছে না। কিন্তু বুড়া মানুষের কাজই সমালোচনা করা। যৌবনের সহজ চক্ষুতে প্রকৃতির সৌন্দর্যগুলাই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু চশমার ভিতর দিয়া কেবল অনেকগুলা খুঁত এবং খুঁটিনাটি চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের গদ্যরচনায় এরপর কিছুটা মন্দা দেখা যায়। এখন থেকে ১২৯৮ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিতর্কমূলক সমাজ ও রাজনীতি-সংক্রান্ত কতিপয় প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু ১২৯৮ সাল থেকে আবার বিচিত্র বিষয়ে বিচিত্র গদ্যরচনার পালা সুরু হল।

এই সময়ের রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। এখন থেকে গল্পরচনার ধারা চলেছে অব্যাহত গতিতে। দ্বিতীয় পর্বের শেষ অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের (১৩০৫) পূর্ব পর্যন্ত মোট ছোটগল্পের সংখ্যা উনপঞ্চাশটি। দুটি গল্প ১৩০৫ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত হলেও আগের রচনা বলে অনুমান করি। সাধু গদ্যে লেখা এই উনপঞ্চাশটি গল্পের মধ্যে সাতটি গল্পের কথোপকথন চলতি, এগারটি গল্পের কথোপকথন সাধু ও চলতির মিশ্রণ এবং একত্রিশটি গল্পে অবিমিশ্র সাধু। ১৩০৫ সালের আষাঢ় থেকে ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত লেখা কোনোও গল্পের কথোপকথনেই আর চলতির ব্যবহার নেই। আবার এরপর থেকে সমস্ত রচনাই অবিমিশ্র চলতির।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার পালা সুরু হয়েছিল পত্রিকার নিয়মিত যোগান দিতে গিয়ে। প্রায় একটানা পাঁচ বছর অসংখ্য গল্পরচনার ফলে রবীন্দ্রনাথের সাধু গদ্য এক আশ্চর্য সুষমায়, মসৃণতায়, সংগীতধর্মিতায়

অনবদ্য হয়ে উঠেছিল। গল্পগুচ্ছ-এর এই সময়কার পরিচ্ছন্ন গদ্যে নিঃসন্দেহে চলতি ভাষার অর্থাৎ ছিন্নপত্র-এর ছোঁয়াচ লেগেছিল। সুন্দর, সহজ, মাধুর্যময় ভাষায় যেন সাতরঙা রামধনুর বর্ণবৈচিত্র্য। কখনো ছোট ছোট সরল বাক্যের অনুচ্ছেদে, সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলিতে ঘটনার দ্রুততাল, আবার কখনো ভাবের প্রকাশবেগে যৌগিক ও জটিল বাক্যে ভাষায় দীর্ঘায়িত সংগীত-তরঙ্গিত গীতিচ্ছন্দ। যেমন, প্রথমটির নিরলংকৃত সহজ দৃষ্টান্ত :

> সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না, সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারিদিকে চায়—ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্ম পরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল—অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ শুনিতে পাইল না।—সুভা।

এই পদ্ধতির অলংকৃত, সংগীত-ঝঙ্কৃত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চোখে পড়ে আরও কিছু পরে, যেমন অতিথি (ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২) গল্পে।

> দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘনমেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা—চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারা-

> বর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় প্রকার পদ্ধতির নিদর্শন দিই মানভঞ্জন (বৈশাখ ১৩০২) থেকে। অবশ্য কোনো পদ্ধতিরই নিরঙ্কুশ প্রয়োগ আনুপূর্বিক আশা করা চলে না। এখানে তাই উভয় পদ্ধতিই মিশ্রিত।

> একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বাসন্তীরঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণ বাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাদের উপর বসিয়াছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উলটিয়া পালটিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নূতন নূতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত। হীরামুক্তার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উন্মাদনা সঞ্চার করিত—ঝল্‌মল্‌ করিয়া, রুনুঝুনু বাজিয়া তাহার চারিদিকে একটা হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চুনী ও মুক্তার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বামহস্তের অঙ্গুলিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোল কোমল রক্তোৎপলপদপল্লবে হাত বুলাইতেছিল, এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, "আহা বউঠাকরুন, আমি যদি পুরুষমানুষ হইতাম, তাহা হইলে এই পা দুখানি বুকে লইয়া মরিতাম।" গিরিবালা সগর্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, "বোধ করি বুকে না লইয়াই মরিতে হইত—তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম। আর বকিস নে। তুই সেই গানটা গা।"
>
> সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—
>
> দাসখত দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
> সকলে সাক্ষী থাকুক বৃন্দাবনে।
>
> তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া, উড়ানি

উড়াইয়া, হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল—সুধো অনেকখানি জিভ কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল, তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মতো গুরুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না; শিখিপুচ্ছচূড়া পায়ের কাছে লুটাইল না; কেহ রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না, "কেন পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদনশশী।" সংগীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, "একবার চাবিটা দাও দেখি।"

এই পর্বের উল্লেখযোগ্য অপর রচনা পঞ্চভূত-এর প্রবন্ধগুলি। রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রিকায় ১২৯৯ সালের মাঘমাস থেকে ১৩০২ সালের ভাদ্রমাস পর্যন্ত প্রথমদিকে নিয়মিত, পরে অনিয়মিত ভাবে ষোলটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলির 'ডায়ারি' নাম দেওয়া হলেও, ডায়ারির সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই, সাহিত্যতত্ত্ব সৌন্দর্যতত্ত্ব ইত্যাদি তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে ছয়টি চরিত্রের কথোপকথনমূলক আলোচনা। এই প্রবন্ধগুলিই (কোনো কোনোটি কিছুটা মার্জিত রূপে) পঞ্চভূত গ্রন্থে ১৩০৪ সালে (১৮৯৭) প্রকাশিত হয়।

পঞ্চভূত নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা। চিন্তার গভীরতা, প্রকাশের মৌলিকতা ও কল্পনার ব্যাপকতায় গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণত্বের পরিচয় বহন করে। প্রবন্ধগুলির ভঙ্গি (পল্লীগ্রামে, মন—এই দুইটি বাদে) ছোটগল্পের, মাঝে মাঝে আকস্মিক নাটকীয়তার প্রক্ষেপে বৈচিত্র্যময়; সর্বোপরি বর্ণনাভঙ্গিটি গুরু ও লঘুর মিশ্রণের ফলে অতিশয় উপাদেয়। ভাষারীতি সামগ্রিক ভাবে সাধু, কিন্তু সরল ও ব্যঞ্জনাময়-বাক্যবিন্যাসে শব্দ-প্রয়োগে কোথাও আতিশয্য নেই, বক্তব্যবিষয় পরিস্ফুট করতে গিয়ে কোথাও মননশীলতার অতিবিস্তার নেই কিংবা সৌন্দর্য-বোধোদ্দীপ্ত হৃদয়ের আত্মগত উচ্ছ্বাসও নেই। এই প্রবন্ধগুলিতে আছে তীক্ষ্ণ গভীর মননশীলতার সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রবল সৌন্দর্যানুভূতির অভাবনীয় পরিমাণ-সামঞ্জস্য। এবং এর স্টাইলটি মহৎ স্টাইলেরই সগোত্র। কৌতুকহাস্য থেকে এর ভাষাভঙ্গির একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

ক্ষিতি কহিল, 'বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও। কথাটা একপ্রকার শেষ হইয়াছে। যতটুকু পীড়নে সুখ বোধহয় তাহা তোমরা অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি যে, কমেডির হাস্য এবং ট্রাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে—'

ব্যোম কহিল, 'যেমন বরফের উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিকমিক করিতে থাকে, এবং রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে। তুমি কতকগুলি প্রহসন ও ট্রাজেডির নাম করো, আমি তাহা হইতে প্রমাণ করিয়া দিতেছি—'

এমন সময় দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীপ্তি কহিলেন, 'তোমরা কী প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ।'

ক্ষিতি কহিল, 'আমরা প্রমাণ করিতেছিলাম যে, তোমরা এতক্ষণ বিনা কারণে হাসিতেছিলে।'

শুনিয়া দীপ্তি স্রোতস্বিনীর মুখের দিকে চাহিলেন, স্রোতাস্বিনী দীপ্তির মুখের দিকে চাহিলেন, এবং উভয়ে পুনরায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোম কহিল, 'আমি প্রমাণ করিতে যাইতেছিলাম যে, কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্রাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।'

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর সুমিষ্ট সম্মিলিত হাস্যরবে পুনশ্চ গৃহ কূজিত হইয়া উঠিল, এবং অনর্থক হাস্য-উদ্রেকের জন্য উভয়ে উভয়কে দোষী করিয়া পরস্পরকে তর্জন-পূর্বক হাসিতে হাসিতে সলজ্জভাবে দুই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষ সভ্যগণ এই অকারণ হাস্যোচ্ছ্বাস-দৃশ্যে স্মিতমুখে অবাক হইয়া রহিল। কেবল সমীর কহিল, 'ব্যোম, বেলা অনেক হইয়াছে, এখন তোমার ঐ বিচিত্র বর্ণের নাগপাশ-বন্ধনটা খুলিয়া ফেলিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা দেখি না।'

ক্ষিতি ব্যোমের লাঠিগাছটি তুলিয়া অনেকক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, 'ব্যোম, তোমার এই গদাখানি কি কমেডির বিষয় না ট্রাজেডির উপকরণ।'

সাধনা পত্রিকার চতুর্থবর্ষ থেকে (অগ্রহায়ণ ১৩০১) রবীন্দ্রনাথ তার সম্পাদক হয়েছিলেন। এই সময় তিনি অনেকগুলি গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন। বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থসমালোচনার যে-আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তারই অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে গ্রন্থসমালোচনার দায়িত্বটি তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু সমালোচনার যে-পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছিলেন তা বাংলা সাহিত্যে নতুন। তাঁর সুবিখ্যাত রাজসিংহ-এর সমালোচনাটি অবশ্য সম্পাদক হওয়ার আগেই সাধনা-য় প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যান্য সমালোচনার মধ্যে আছে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ফুলজানি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আর্যগাথা, সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের মৃত্যু উপলক্ষে লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলাল প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলির মতো তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক অবজেক্টিভ্ সমালোচনাপ্রবন্ধ বাংলা গদ্যে সম্ভবত আজও লেখা হয় নি। কোনো কোনো লেখক ও তাঁদের লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সেদিনই শেষকথা বলে দিয়েছিলেন।

এই পর্বের শেষদিকের রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলি ভাষার দিক থেকে স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবি রাখে। রাজনীতির মৌলিক তত্ত্ব আলোচনার কেন্দ্রবস্তু হলেও এই প্রবন্ধগুলি রচনার পেছনে ছিল তখনকার দিনের সাময়িক ঘটনা-প্রেরণা। এইজন্য রচনাগুলিতে কখনো ক্ষোভ, কখনো বেদনা, কখনো ব্যঙ্গ—বিবিধ অনুভূতি পুঞ্জীভূত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে ; কিন্তু সবকিছুকে ধারণ করে রেখেছে এক প্রবল সংযমবোধ, যার অভাব ঘটলে সাময়িক ভাবে উত্তেজিত মানসিকতায় বিশৃঙ্খলা অনিবার্যরূপে দেখা দিত। প্রবন্ধগুলির ভাষাভঙ্গি স্বভাবতই গম্ভীর, ব্যঙ্গের জন্য তৎসম-শাণিত, কিন্তু সরল ও প্রাঞ্জল। আবেগ ও যুক্তির সামঞ্জস্য থাকলেও মাঝে মাঝে তপ্ত আবেগ নিছক যুক্তিকে পরিহার করে অলংকার ও তরঙ্গিত বাক্যভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সিডিশন-বিল পাশ হবার আগের দিন টাউন-হলে কণ্ঠরোধ নামে

যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫) তা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই।

সিপাহীবিদ্রোহের পূর্বে হাতে হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না—সেই নির্বাক নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ংকর নহে। সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ, সেইজন্যই কি তাহা নিদারুণ নহে। সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না। যদি কখনো কোনো ঘনান্ধকার অমাবস্যারাত্রে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে তবে সিংহদ্বারের কুক্কুর না ডাকিতেও পারে, রাজার প্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গের কঙ্কণকিঙ্কিণীনূপুরকেয়ুর, তাহার বিচিত্র ভাষার বিচিত্র সংবাদপত্রগুলি কিছু-না-কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না। প্রহরী যদি নিজহস্তে সেই মুখর ভূষণগুলির ধ্বনি রোধ করিয়া দেন তবে তাঁহার নিদ্রার সুযোগ হইতে পারে, কিন্তু পাহারার কী সুবিধা হইবে জানি না।

১২৯৮ সালে যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন ঠিক সেই সময়েই একধরনের ব্যঙ্গ প্রবন্ধ রচনাও সুরু করেছিলেন। অনাবিল হাস্যরস বা কৌতুকরস সৃষ্টি নয়, এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যত শ্রেণী-বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষকে হাস্যাস্পদ করা। এই ধরনের রচনার প্রথম পরিচয় পাই রসিকতার ফলাফল (ভারতী, বৈশাখ ১২৯২) প্রবন্ধে। গুরুবিষয়কে কৌতুকরসে সরস ও স্বাদু করে তোলা রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার অন্যতম বিশিষ্ট ভঙ্গি। কিন্তু এই প্রবন্ধগুলিতে গুরুতর বিষয় ব্যঙ্গ ও কৌতুকের উপাদান মাত্র। এগুলির ভাষা ও ভঙ্গি তাই স্বতন্ত্র। এই ধরনের ব্যঙ্গরচনার ভাষা স্বভাবতই তৎসমবহুল ; কিন্তু যমক ও অনুপ্রাস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গরস সৃষ্টির একটু সুন্দর নমুনা দিই প্রত্নতত্ত্ব থেকে :

আমাদের ভারত-ইতিহাস-সমুদ্রের পাতিহাঁস, বঙ্গসাহিত্য-কুঞ্জের

গুঞ্জোন্মত্ত কুঞ্জবিহারীবাবু কলম ধরিয়াছেন ; অতএব প্রাচীন ভারত সাবধান ! কোথায় খোঁচা লাগে কী জানি । অপোগণ্ডদের যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে তবে নিজের সুধাভাণ্ডে দণ্ডপ্রহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ? অথবা বহুদর্শী প্রাচীন ভারতকে সাবধান করা বাহুল্য, উদ্যত-লেখনী কুঞ্জবিহারীকে দেখিয়া তিনি পবিত্র উত্তরীয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বসিয়া আছেন । তাই আমাদের এই আমড়াতলার দামড়াবাছুরটি প্রাচীন ভারতে গ্যালভানিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেনের সংস্কৃত নাম খুঁজিয়া পাইলেন না । ধন্য তাঁহার দেশহিতৈষিতা ।

১২৯৮ (১৮৯১) সালের পর আর কখনো রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের প্রবন্ধ লেখেন নি । তবে এই ভাষা ও ভঙ্গির সাক্ষাৎ মেলে বিভিন্ন রচনার মধ্যে ইতস্তত বিচ্ছিন্ন ভাবে ।

তৃতীয় পর্ব

সাধু গদ্য

এরপর থেকে যে পর্বের সুরু, সেই পর্বই রবীন্দ্রনাথের সাধু গদ্যের শ্রেষ্ঠ পর্ব । কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের সাধু গদ্যের এমন ঐশ্বর্যদীপ্ত, মহনীয়, রাজকীয় রূপ আগে কখনো দেখা যায় নি, পরেও না ।

আগের পর্ব থেকে এই পর্বে উত্তরণের ক্ষেত্রে কোনো আকস্মিকতা নেই । অবিশ্রান্ত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শব্দ ও অর্থকে কখনো সঙ্গীতে চিত্রে মণ্ডিত করে, কখনো বা ওজঃমাধুর্যগুণে ভূষিত করে, আবার কখনো বা কেবলমাত্র স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতার সারল্যে অনাবৃত করে তিনি যে-বাণী-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, এই পর্বে যেন তারই সিদ্ধি । এই পর্বের প্রথম দিকে ভাষা ও ভঙ্গির বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট, কিন্তু ক্রমশ একটিমাত্র রমণীয় পরিণামের অভিমুখী ।

এই পর্বের প্রথম দিকে, ১৩০৫ সাল থেকে ১৩১০ সাল পর্যন্ত, গল্পের সংখ্যা সতেরোটি । আগেই বলেছি, এই পর্বের গল্পগুলির কথোপকথনেও সাধু ভাষার নিরঙ্কুশ আধিপত্য । একমাত্র কর্মফল (পৌষ ১৩১০) গল্পটির কথোপকথন চলতি, কিন্তু গল্পটিকে নাটিকা বলাই ভাল । এই গল্পটির পর থেকেই ভাষায় তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ ক্রমবর্ধমান, ভঙ্গিতেও সাধুর কাঠিন্য, আগেকার সেই প্রবাহিত মসৃণ সঙ্গীত-তারল্যের বদলে ক্রমশ তীব্র তীক্ষ্ণ মন্দ্র-মুখরতার আত্মপ্রকাশ । কিন্তু এই পর্যন্ত এসে ভাষা যেন মসৃণতা ও সরলতার চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে । ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণে লেখা মণিহারা-র ভাষা এইরকম :

> তখন ফণীভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল, ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিরা প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া । সেই কঙ্কালের আট আঙুলে

আংটি, করতলে রতনচুক্র, প্রকোষ্ঠে বালা; বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তক অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালো তারা সেই দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি। আজ আটারো বৎসর পূর্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের শাহানা আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়ত সুন্দর কালো-কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল; দেখিয়া তাহার সর্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মতো নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

কিন্তু ভাষার মসৃণতা ও সরলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নষ্টনীড় গল্পটি। এটি লেখা হয় ১৩০৮ সালের বৈশাখ-অগ্রহায়ণ মাসে ভারতী-তে। অনলংকৃত সরল সাধু ভাষায় রচিত এই গল্পটি ভাষার দিক থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নষ্টনীড়-এর পর থেকে ১৩১০ সালের পৌষ পর্যন্ত মাত্র তিনটি গল্প লেখা হয়, কিন্তু তারপর থেকে ১৩১৪ সাল পর্যন্ত কোনো ছোটগল্প লেখা হয় নি। অথচ এই সময়ের মধ্যেই তিনি লিখেছেন চোখের বালি ও নৌকাডুবি উপন্যাস। চোখের বালি প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন-এ ১৩০৮ সালের বৈশাখ থেকে ১৩০৯ সালের কার্তিক পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে। এই সময়েই ভাষায় অলংকারবাহুল্য ও সঙ্গীত-চিত্রের কারুকার্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বাক্যবিন্যাসে এসেছে অপেক্ষাকৃত মন্থরতা, যেন সর্বাভরণে ভূষিত রাজেন্দ্রাণীর মন্দমরালগতি। নষ্টনীড়-এর পরই চোখের বালি-র ভাষায় বিস্ময়কর রূপপরিবর্তন, অথচ দুটি লেখা সুরু হয়েছিল একই সঙ্গে। যেমন:

আষাঢ়ের গঙ্গা সম্মুখে বহিয়া চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া পরপারে নীলমেঘ ঘনশ্রেণী গাছপালার উপরে ভারাবনত নিবিড়ভাবে

আবিষ্ট হইয়া ওঠে; সমস্ত নদীতল ইস্পাতের তরবারির মতো কোথাও বা উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, কোথাও বা আগুনের মতো ঝকমক করিতে থাকে। নববর্ষার এই সমারোহের মধ্যে যেমনি বিহারীর দৃষ্টি পড়ে অমনি তাহার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আকাশের সেই নীলস্নিগ্ধ আলোকের মধ্যে কে একাকিনী বাহির হইয়া আসে, কে তাহার স্নানসিক্ত ঘনতরঙ্গায়িত কৃষ্ণকেশ উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়ায়, বর্ষাকাল হইতে বিদীর্ণ মেঘচ্ছুরিত সমস্ত বিচ্ছিন্ন রশ্মিকে কুড়াইয়া লইয়া কে একমাত্র তাহারই মুখের উপরে অনিমেষ দৃষ্টির দীপ্ত কাতরতা প্রসারিত করে।

১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণের পর থেকে লেখা প্রাচীন সাহিত্য-এর অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির ভাষার সঙ্গে চোখের বালি-র ভাষার সাদৃশ্য অতি প্রকট। প্রাচীন সাহিত্য-এর প্রবন্ধগুলিতে বিশেষত কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা এবং শকুন্তল প্রবন্ধে কাব্যনাটক সমালোচনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ভাষায় মূল সংস্কৃতের শব্দ ও বাক্যাংশ সাধু গদ্যের কাঠামোয় দৃঢ়পিনদ্ধ কায়া লাভ করেছে। অবশ্য সমাসবদ্ধ পদের জন্য এ ভাষার গতি আরও মন্থর। যেমন:

যে ত্রিলোচন বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরীকে এক মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তিনি দিবসের শশিলেখার ন্যায় কর্শিতা শ্লথলম্বিত-পিঙ্গল-জটা-ধারিণী তপস্বিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণ হৃদয়ে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। লাবণ্যপরাক্রান্ত যৌবনকে পরাকৃত করিয়া পার্বতীর নিরাভরণা মনোময়ী কান্তি অমলা জ্যোতির্লেখার মতো উদিত হইল। প্রার্থিতকে সে সৌন্দর্য বিচলিত করিল না, চরিতার্থ করিয়া দিল। তাহার মধ্যে লজ্জা আশঙ্কা আঘাত আলোড়ন রহিল না; সেই সৌন্দর্যের বন্ধনকে আত্মা আদরে বরণ করিল, তাহার মধ্যে নিজের পরাজয় অনুভব করিল না।

এই সময়ে লেখা ভারতবর্ষ, আত্মশক্তি প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভাষার এই দৃঢ় কঠিন সমর্থ রূপেরই পরিচয় পাই। তবে প্রবন্ধগুলির ভাষায় অলংকার-বাহুল্য অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু ওজোগুণ বেশি। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু। গুরুতর বিষয়বস্তু নিয়ে এত বেশি এবং

এতো জোরালো প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ আর অন্য কোনো পর্বে লেখেন নি। প্রবন্ধগুলির ভঙ্গিতে পরিহাসস্নিগ্ধতা অনুপস্থিত, মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু সে ব্যঙ্গ মর্মভেদী শাণিত ক্ষুরধার, রচনার সমগ্র ভঙ্গিটিই উচ্চগ্রামে বাঁধা।

নৌকাডুবি উপন্যাসটিও প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদর্শন-এ ১৩১০ সালের বৈশাখ থেকে ১৩১২ সালের আষাঢ় পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে। তার প্রায় দুই বছর পরে ১৩১৪ সালের ভাদ্র থেকে প্রকাশিত হতে থাকে রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তম উপন্যাস গোরা। নৌকাডুবি-তে চোখের বালি-র ভাষারই অনুবৃত্তি, ভঙ্গি তেমনি মন্থর ভারাক্রান্ত, কিন্তু তবুও অলংকার-বর্জনের প্রবণতায় ও শব্দবিন্যাসকৌশলে ভাষাদেহে লঘুতার সঞ্চার অনেক অংশে দেখা দিয়েছে। মূল ভাষাভঙ্গিটি অবশ্যই পূর্ববৎ। যেমন:

> তীরের বনরাজি অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যাবধূর সোনার অঞ্চলে কালোপাড় টানিয়া দিল। গ্রামান্তরের বিলের মধ্যে সমস্ত দিন চরিয়া বন্যহংসের দল আকাশের ম্লানায়মান সূর্যাস্তদীপ্তির মধ্য দিয়া ওপারের তরুশূন্য বালুচরে নিভৃত জলাশয়গুলিতে রাত্রিযাপনের জন্য চলিয়াছে। কাকেদের বাসায় আসিবার কলরব থামিয়া গেছে। নদীতে তখন নৌকা ছিল না; একটিমাত্র বড়ো ডিঙ্গি গাঢ় সোনালি-সবুজ নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়া আপন কালিমা বহিয়া নিঃশব্দে গুণ টানিতেছিল।
>
> রমেশ জাহাজের ছাদের সম্মুখভাগে নবোদিত শুক্লপক্ষের তরুণ চাঁদের আলোকে বেতের কেদারা টানিয়া লইয়া বসিয়াছিল।

নৌকাডুবি রচনার সমকালেই অলংকারবাহুল্যহীন স্পষ্টতা ও ঋজুভঙ্গি দেখা দিয়েছিল কিছু কিছু প্রবন্ধের ভাষাতেও; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা সংক্রান্ত কিছু প্রবন্ধ। এদের মধ্যে আগেকার বাগ্‌বিস্তৃতি অথবা শব্দৈশ্বর্যের আতিশয্য নেই, বাক্যবিন্যাসে জটিলতা নেই। এই ভাষারই আরো পরিণত আরো বলিষ্ঠ রূপ চোখে পড়ে গোরা উপন্যাসে।

গোরা লেখা সুরু হয়েছিল ১৩১৪ সালের ভাদ্রমাসে প্রবাসীতে, শেষ হয়েছিল ১৩১৬ সালের চৈত্রমাসে বত্রিশ কিস্তিতে। গোরা-র ভাষা

যথাসম্ভব বাহুল্যবর্জিত, কিন্তু পরিমার্জিত এবং পরিমিত। এর শব্দপ্রয়োগে বাক্যবিন্যাসে একধরনের মহাকাব্যোচিত কঠিন সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। অসংখ্য অধ্যায় জুড়ে, সংখ্যাহীন বাক্যপরম্পরা যেন বর্ষাস্ফীত জলধারার মতো অনিবার্য গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, সে জলধারায় কোথাও অতিস্ফীতি নেই, দুকূল-প্লাবিত-করা-বন্যার উচ্ছ্বাস নেই, আছে শুধু দুর্বার গতিধারার অমোঘ অনায়াস প্রয়াণ। বিষয়বস্তুর মতোই গোরা-র ভাষা ওজস্বী ও মহীয়ান। গোরা-র ভাষার দৃষ্টান্ত দিই:

> সুচরিতার সেই সংকোচবিহীন সংশয়বিহীন অশ্রুধারা-প্লাবিত দুই চক্ষুর সম্মুখে, ভূমিকম্পে পাথরের রাজপ্রাসাদ যেমন টলে তেমনি করিয়া গোরার সমস্ত প্রকৃতি যেন টলিতে লাগিল। গোরা প্রাণপণ বলে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইবার জন্য মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গলির রেখা সংকীর্ণ হইয়া যেখানে বড়ো রাস্তায় পড়িয়াছে সেখানে খোলা আকাশে কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর তারা দেখা যাইতেছে। সেই আকাশখণ্ড, সেই ক'টি তারা গোরার মনকে আজ কোথায় বহন করিয়া লইয়া গেল—সংসারের সমস্ত দাবি হইতে, এই অভ্যস্ত পৃথিবীর প্রতিদিনের সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি হইতে কতদূরে! রাজ্যসাম্রাজ্যের কত উত্থানপতন, যুগযুগান্তরের কত প্রয়াস ও প্রার্থনাকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া ওইটুকু আকাশ এবং এই ক'টি তারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে; অথচ অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্য হইতে এক হৃদয় যখন আর এক হৃদয়কে আহ্বান করে তখন নিভৃত জগৎপ্রান্তের সেই বাক্যহীন ব্যাকুলতা যেন ওই দূর আকাশ এবং দূর তারাকে স্পন্দিত করিতে থাকে। কর্মরত কলিকাতার পথে গাড়ি-ঘোড়া ও পথিকের চলাচল এই মুহূর্তে গোরার কাছে ছায়াছবির মতো বস্তুহীন হইয়া গেল—নগরের কোলাহল কিছুই তাহার কাছে আর পৌঁছিল না। নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল—সে-ও ওই

আকাশের মতো নিস্তব্ধ, নিভৃত অন্ধকার এবং সেখানে জলে-ভরা দুইটি সরল সকরুণ চক্ষু, নিমেষ হারাইয়া যেন অনাদিকাল হইতে অনন্তকালের দিকে তাকাইয়া আছে।

গোরা-র ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের কথোপকথনে চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। আগের সবকটি উপন্যাসের কথোপকথনে সাধু ভাষা থাকায় ছন্দস্পন্দের দিক থেকে আদ্যন্ত ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে বিশেষ কোনই অসুবিধা ঘটে নি। এর আগে যে কয়েকটি গল্পের কথোপকথনে চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন, সূক্ষ্মবিচারে একথা স্বীকার করতেই হবে, তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। সেইসব ক্ষেত্রে সর্বত্র সাধুর দীর্ঘায়িত তালের সঙ্গে চলতির শ্বাসাঘাতের সামঞ্জস্য ঘটে নি। কিন্তু গোরা-য় উভয়বিধ রীতির ভাষার পারম্পরিক বিন্যাসের মধ্যে বিষম তালের যে-সুন্দর ভারসাম্য ঘটেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। এবং এই ভারসাম্য রক্ষা করা রবীন্দ্রনাথের মতো কবি ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে অসম্ভব ছিল। গোরা-র পরিশিষ্ট থেকেই এই ভারসাম্যের পরিচয় মিলবে :

> গোরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—আনন্দময়ী তাঁহার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন।
>
> গোরা আসিয়াই তাঁহার দুই পা টানিয়া লইয়া পায়ের উপর মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুই হাত দিয়া তাহার মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন।
>
> গোরা কহিল, "মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।—
>
> "মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে।"
>
> তখন আনন্দময়ী অশ্রুব্যাকুলকণ্ঠে মৃদুস্বরে গোরার কানের কাছে কহিলেন, "গোরা, এইবার একবার বিনয়কে ডেকে পাঠাই।"

গোরা-র পর রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় রচনা জীবনস্মৃতি। জীবনস্মৃতি ছাপা সুরু হয়েছিল প্রবাসী-তে ১৩১৮ সালের ভাদ্রমাস থেকে, শেষ হয়েছিল পরের বছর চৈত্রমাসে। কিন্তু জীবনস্মৃতি-র রচনা পত্রিকায় প্রকাশের আগেই শেষ হয়েছিল। জীবনস্মৃতি-তে রবীন্দ্রনাথের সাধু গদ্য পূর্ণপরিণত রূপ পেয়েছে। গোরা-র চেয়েও এর ভাষা বাহুল্যবর্জিত ও দ্রুতগামী। এর ভঙ্গিতে চলতির প্রভাব স্পষ্ট, চলতি বুলি ও শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত। ভাষাকে অলংকৃত করার কোনো চেষ্টা নেই, কোনো বিশেষ ভঙ্গিকে প্রবল করে তোলার কোনো প্রয়াস নেই। অলংকার যা আছে, তা ভাষাদেহেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—অপৃথক যত্নসম্ভূত। এ ভাষার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে প্রসাদগুণ। প্রসাদগুণ বলতে বোঝায়, যে-গুণ থাকলে সকল রসই স্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়। জীবনস্মৃতি-র ভাষা প্রাচীন আলংকারিকদের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রসাদগুণেরই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এমন মনোরম, মনোহারী, এমন প্রসন্নমধুর মন-জানানো ভাষার কোনো তুলনা কোথাও মেলে কিনা জানি না। জীবনস্মৃতি-র ভাষায় মহৎ শিল্পকর্মের যে 'ফিনিশ' বা শেষ উৎকর্ষ আছে, বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতিতে তার কোনো পরিচয় মিলবে না। তবুও একটি সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃতি করি :

> আমাদের বাড়ির ভিতরের ছাদের প্রাচীর আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। যখন একটু বড়ো হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে নূতন বধূসমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গীরূপে তাঁহার কাছে প্রশ্রয় লাভ করিতেছি, তখন এক-এক-দিন মধ্যাহ্নে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তখন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিয়াছে; গৃহকর্মে ছেদ পড়িয়াছে; অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন, স্নানসিক্ত শাড়িগুলি ছাদের কার্নিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে; উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নির্জন অবকাশে প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হইতে এই খাঁচার পাখির সঙ্গে ওই বনের পাখির চঞ্চুতে চঞ্চুতে পরিচয় চলিত। দাঁড়াইয়া চাহিয়া

থাকিতাম—চোখে পড়িত আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেলশ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত 'সিঙ্গির বাগান' পল্লীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে যে তারা গয়লানী আমাদের দুধ দিত তাহারই গোয়ালঘর; আরো দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত; মনে হইত, তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিতে চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্ধুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমানিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ওই অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা ও কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই করা মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারি সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

চলতি গদ্য

এই পর্বকে রবীন্দ্রনাথের নিরঙ্কুশ সাধু গদ্যরচনার পর্ব বলেছি। প্রকৃতপক্ষে ১৩০৫ সালের পৌষমাসের (ডিসেম্বর ১৮৯৫) ছিন্নপত্র-এর পর থেকে ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত একান্ত ব্যক্তিগত পত্র, পাঁচটি ছোটবড় নাটক, কয়েকটি অতি ছোট শিশুপাঠ্য কৌতুকনাট্য ছাড়া রবীন্দ্রনাথ এই দশ বছরে চলতি ভাষার ব্যবহারই করেন নি। কিন্তু এই পর্বের শেষদিকে তাঁকে চলতি ভাষার রচনায় মনোযোগী হতে দেখি। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১৩২১ সালের পৌষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে তিনি যে-সব উপদেশ দিয়েছিলেন, সেগুলি শান্তিনিকেতন নামে সতেরো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডগুলিতে প্রায় দেড়শ ছোটবড় রচনা আছে এবং রচনাগুলি সবই চলতি ভাষায় লেখা। রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যে এই রচনাগুলির বিশিষ্ট স্থান আছে। এই উপদেশমালার রচনাগুলি "সুদৃঢ় জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধ্যানদ্বারা উপলব্ধ, আত্মানুভূত রসের দ্বারা স্নিগ্ধোজ্জ্বল, বহুব্যাপক অনুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত"*। এর আগে এই ধরনের দার্শনিক তাত্ত্বিক এবং উপলব্ধিগত বিষয় আলোচনায় কখনো চলতি ভাষাকে ব্যবহার করা হয় নি। এতদিন চলতি ভাষা যেন ডায়ারি-বর্ণনা অথবা প্রতিদিনের চলমান জীবনযাত্রার অপসৃয়মাণ দৃশ্যপট অংকনে, বড়জোর আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের ক্ষণিক প্রকাশেই সীমাবদ্ধ ছিল। জ্ঞানের দৃঢ়তা, ধ্যানের উপলব্ধি অথবা রসের অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে নিত্যতা অর্জন করা যেন তার সামর্থ্যের বহির্ভূত ছিল। কিন্তু এবার রবীন্দ্রনাথ উপদেশগুলি রচনা করে প্রমাণ করলেন যে চলতি ভাষার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ নয়, তাকে অনায়াসেই নিগূঢ় তত্ত্বচিন্তার বাহন করা চলে। সাধু ভাষার সঙ্গে দীর্ঘ দশবছর ধরে চলতি ভাষার সমান্তরাল অনুশীলনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে দুই রীতির তুলনামূলক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেছিলেন এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তী পর্বে সম্পূর্ণভাবে চলতি রীতিকে অবলম্বন করেছিলেন। এই

উপদেশমালা রচনার যুগটি মনে রাখলে পরবর্তীযুগে রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্বকে আকস্মিক বা 'বাংলা গদ্যের জাত্যন্তর' ঘটানোর অপচেষ্টা বলে মনে হবে না।

শান্তিনিকেতন উপদেশমালার ভাষা প্রথম থেকেই স্বচ্ছ সরল ও বেগবান। চলতি রীতি অনুযায়ী ছোট ছোট বাক্যবিন্যাসের ফলে গতি হঠাৎ-তরঙ্গিত। যেমন :

> কালকের উৎসবমেলার দোকানি-পসারিরা এখনও চলে যায়নি। সমস্ত রাত তারা এই মাঠের মধ্যে আগুন জ্বেলে গল্প করে, গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।
>
> কৃষ্ণাচতুর্দশীর শীতরাত্রি। আমি যখন আমাদের নিত্য উপসনার স্থানে এসে বসলুম তখনও রাত্রি প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। চারি দিকে নিবিড় অন্ধকার, এখানকার ধূলিবাষ্পশূন্য স্বচ্ছ আকাশের তারাগুলি দেবচক্ষুর অক্লিষ্ট জাগরণের মতো অক্লান্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে। ভাঙা মেলার লোকেরা শুকনো পাতা জ্বালিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে।
>
> অন্যদিন এই ব্রাহ্মমুহূর্তে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা! বাগানের সমস্ত পাখি জেগে গেয়ে উঠলেও সে স্তব্ধতা নষ্ট হয় না, শালবনের মর্মরিত পল্লবরাশির মধ্যে পৌষের উত্তরে হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠলেও সেই শান্তিকে স্পর্শ করে না।—মানুষ, ৮ পৌষ ১৩১৫।

কেবলমাত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে নয়, গূঢ় ভাবনা ও চিন্তা প্রকাশের ক্ষেত্রেও ভাষার এই স্বচ্ছতা সরলতা অব্যাহত আছে। বিষয়বস্তুর বিশিষ্টতার জন্য শব্দগুলি স্বাভাবিকভাবে তৎসমবহুল, কিন্তু সমাসের ব্যবহার একেবারে কম। আর সমাসহীনতার জন্যই ভাষা এত সাবলীল। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে সাধু রীতির দীর্ঘায়িত জটিল বাক্যবিন্যাসেরও সাক্ষাৎ মেলে। যেমন :

> এইরকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করে যখন ঘুমোচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখির কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসংগীতের সুর এসে পৌঁছল—যে সুরে লোকলোকান্তর যুগযুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে সুরে পৃথিবীর

> ধূলির সঙ্গে সূর্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝংকৃত হয়েছে, সেই সুর একদিন শোনা গেল।—নবযুগের উৎসব, ফাল্গুন ১৩১৫।

কিন্তু এই জটিল বাক্যভঙ্গি উপদেশমালার রচনার প্রধান ভঙ্গি নয়, সে ভঙ্গি চলতি ভাষারীতির ছোট ছোট বাক্যবিন্যাসেরই ভঙ্গি; বহু ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ অনুক্ত কিন্তু বাক্যাংশগুলি সুশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত এবং তালসমন্বিত। সে ভাষার পরবর্তী নমুনা এই রকম;

> আমাদের জীবনের বীণাতে, সংসারের বীণাতে প্রতিদিন তার বাঁধা চলছে,—সুর বাঁধা এগোচ্ছে। সেই বাঁধবার মুখে কত কঠিন আঘাত, কত তীব্র বেসুর। তখন চেষ্টার মূর্তি, কষ্টের মূর্তিটাই বারবার করে দেখা যায়। সেই বেসুরকে সমগ্রের সুরে মিলিয়ে তুলতে এত টান পড়ে যে, এক-এক সময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি ছিঁড়ে।
>
> এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয়, তবে বুঝি সার্থকতা কোথাও নেই—কেবলই বুঝি এই টানাটানি বাঁধাবাঁধি—দিনের পর দিন কেবলি খেটে মরা, কেবলি ওঠা পড়া, কেবলই অহংযন্ত্রটার অচল খোঁটার মধ্যে বাঁধা থেকে মোচড় খাওয়া—কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিণাম নেই—কেবলই দিনযাপন মাত্র।—জাগরণ, ১৭১৭।

১৩২১ সালের শ্রাবণমাসে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ চলতি গদ্যে লেখেন স্ত্রীর পত্র গল্প। এই গল্পটিতে নিরঙ্কুশ চলতি পর্বে উত্তরণের সোপান বললে অত্যুক্তি হবে না।

চতুর্থ পর্ব

চলতি গদ্য

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার চতুর্থ বা শেষপর্ব দীর্ঘতম পর্ব, ১৩২১ সাল থেকে ১৩৪৮ সাল—সুদীর্ঘ সাতাশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। জীবনস্মৃতি রচনার পর থেকে এই পর্ব সুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুটি খুব বড় ঘটনা—যা রবীন্দ্রনাথের জীবনে অতিশয় উল্লেখযোগ্য—ঘটে গিয়েছিল। তার একটি হচ্ছে, ১৯১৩ সালের নভেম্বর (কার্তিক ১৩২০) মাসে নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি, এবং অপরটি, ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে (শ্রাবণ, ১৩২১) ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ।

এই পর্বের সুরু ১৩২১ সালের ২৫শে বৈশাখ থেকে। ওই দিনটিতে প্রকাশিত হয় তাঁরই পৃষ্ঠপোষণে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় সবুজপত্র নামে নতুন সাহিত্যপত্র। এই বৈশাখে তাঁর জন্মদিন নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পর প্রথম জন্মদিন, তাঁর বয়স তখন তিপ্পান্ন। ছয় মাস আগে শান্তিনিকেতনে নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির সম্বর্ধনার "প্রতিভাষণের প্রতিক্রিয়ায় যে হলাহল" বাংলা সাময়িক সাহিত্যে "উছলিয়া" উঠেছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে যখন সিদ্ধান্ত করেছিলেন সাময়িক পত্রের জন্য তিনি আর কিছু লিখবেন না, সেই সময়েই সবুজপত্র-এর আবির্ভাব। সেদিন এই পত্রকে কেন্দ্র করে যে গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, প্রমথ চৌধুরী সেই গোষ্ঠীর পতি হলেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অধিপতি।

সবুজপত্র-এর উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে গিয়ে সম্পাদক লিখেছিলেন: "বাঙ্‌লার মন যাতে বেশী ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে।" আর রবীন্দ্রনাথ সেই সংখ্যাতেই বিবেচনা ও অবিবেচনা প্রবন্ধে লিখেছেন: সমাজের মধ্যে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাঁধি বোলের বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।......

দেশের নবযৌবনকে তাহারা আর নির্বাসিত রাখিতে পারিবেন না।... তারুণ্যের জয় হউক। তাহার পায়ের তলায় জঙ্গল মরিয়া যাক, জঞ্জাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হউক; তাহার অবিবেচনার উদ্ধত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক্।" এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তখন রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রেরণার নতুন মোড় ঘুরেছে এবং তা অবশ্যই প্রকাশের নতুন পথ খুঁজে নেবে; আর তিনি সে সম্পর্কে সচেতন।

সবুজপত্র-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাই প্রকাশ হতে থাকে। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় হালদার গোষ্ঠী গল্প। ১৩১৮ সালের পৌষের পর এই প্রথম গল্প। ১৩১০ সালের পৌষ থেকে ১৩১৪ সালের আষাঢ় পর্যন্ত তিনি কোনো গল্প লেখেন নি, তারপর থেকে ১৩১৮ সালের মধ্যে লিখেছেন মাত্র চারটি গল্প। তাঁর প্রায় দশ বছরে লেখা গল্পের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে চার। অথচ সাত মাসে সবুজপত্র-এর পর পর সাত সংখ্যায় লিখলেন সাতটি গল্প, তার মধ্যে একটি গল্প (স্ত্রীর পত্র) সম্পূর্ণ চলতি ভাষায়। তারপর সুরু হল মাসিক কিস্তিতে গল্পের আকারে চতুরঙ্গ—১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন সংখ্যায় জ্যাঠামশায়, শচীন, দামিনী ও শ্রীবিলাস গল্পচতুষ্টয়।

নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির পরই যে নতুন ভাব-প্রেরণা জেগে উঠেছিল, তার প্রকাশের মুহূর্তেই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া। প্রথম মহাযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। তারই ফলে নতুন ভাব-প্রেরণায় যে আলোড়ন ঘটবে তা একান্তই স্বাভাবিক এবং এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের মানসিক অস্থৈর্যের ইতিহাসও সুবিদিত। কিন্তু এই অস্থৈর্য বিশৃঙ্খলায় পরিণত হতে পারে নি, কারণ তিনি তখন প্রৌঢ়পরিণত এমন এক মানসিকতার অধিকারী—সুদীর্ঘকালের সাধনায়-সংযমে ও প্রকাশে যে মানসিকতা পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে তাঁর ভাবজীবনের ভারসাম্য বিচলিত হয়েছিল। এই বিচলনের সাক্ষ্য দেয় তাঁর এযুগের গদ্যরীতিও।

চতুরঙ্গ-এর এবং তার আগের ছয়টি গল্পের ভাষাই সাধু। কিন্তু সাধু হলেও তার ভঙ্গিতে কথ্য ভাষার লঘুতা ও বাহুল্যহীনতা প্রবল। হালদার গোষ্ঠী

ও শেষের রাত্রি ছাড়া সবকটি গল্প, চতুরঙ্গ এমনকি উপন্যাস ঘরে-বাইরে-ও আত্মকথামূলক বা নিজের জবানীতে লেখা। উত্তম পুরুষে বা নিজের জবানীতে কোনো কিছু বর্ণনা করতে গেলে স্বভাবতই তাতে কথ্যভঙ্গি এসে পড়ে, এবং তারই সঙ্গে আসে লঘুতা, সেখানে বাহুল্যের অবকাশ কম। এইজন্যই মনে হয়, চলতি ভাষাকে উপন্যাস রচনার একমাত্র বাহন করার প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঘরে-বাইরে উপন্যাসে এই ভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন এবং তারই প্রস্তুতি হিসাবে চতুরঙ্গ রচনার সাধু গদ্যেও এই ভঙ্গিটি পরীক্ষিত হয়েছিল।

চতুরঙ্গ রীতি-বদলের সন্ধিক্ষণের রচনা। এবং সে রীতি-বদল শুধু ভাষারই নয়, ভাব ও রূপেরও। তার ঠিক আগের গল্পগুলিতে সাধু রীতিতে কথ্যভঙ্গি ও বুলির অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটলেও রীতির সাধুত্ব অক্ষুণ্ণই ছিল। সে ভাষার অতিসুন্দর দৃষ্টান্ত বোষ্টমী থেকে উদ্ধৃত করি :

> ভিজা-কাপড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে লজ্জায় একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি জড়োসড়ো হইয়া মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের 'পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর।"
>
> ডালে ডালে রাজ্যের পাখি ডাকিতেছিল, পথের ধারে ধারে ঝোপে-ঝোপে ভাঁটি ফুল ফুটিয়াছে, আমের ডালে বোল ধরিয়াছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ-পাতাল পাগল হইয়া আলুথালু হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বাড়ি গেলাম, কিছু জ্ঞান নাই। একেবারে সেই ভিজা কাপড়েই ঠাকুরঘরে ঢুকিলাম, চোখে যেন ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না—সেই ঘাটের পথের ছায়ার উপরকার আলোর চুমকিগুলি আমার চোখের উপর কেবলই নাচিতে লাগিল।

কিন্তু চতুরঙ্গ-এর ভাষার বিশেষত্ব এই যে, তার সাধু রীতিটি বহিরঙ্গমাত্র, মুখ্যত চলতি রীতির কাঠামোয় সাধু ক্রিয়াপদ ও অসমাপিকার ব্যবহার; সাধু সর্বনাম পদ তিনি ত্যাগ করে সাধু ক্রিয়াপদের সঙ্গে চলতি সর্বনামের অন্বয় করেছেন, এমন কি কোনো কোনো ক্রিয়াপদের চলতি রূপই ব্যবহৃত

হয়েছে। অথচ কোথাও ভাষাদেহে পীড়নের চিহ্ন নেই, কোথাও স্বাচ্ছন্দের হানি ঘটে নি। সাধুর সঙ্গীতময় তরঙ্গিত তালের সঙ্গে চলতির ছোট ছোট বাক্যে সমাপ্ত আহত-তালের মিশ্রণে এক স্বতন্ত্র তালবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। চতুরঙ্গ-এর গদ্যরীতি রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির ইতিহাসে এইজন্যই অতি-বিশিষ্ট। সাধু ও চলতির এমন আশ্চর্য হরিহর-মূর্তি আর কখনো দেখা যায় নি। এই রীতি রবীন্দ্রনাথের সাধু রীতির শেষ সীমাও বটে। তার দৃষ্টান্ত এই রকম :

> সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারী একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তার সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিভিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝর্ ঝর্ শব্দে উপরে নিচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কী যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ তার নানা রকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙ্গিয়া হুড়্মুড়্ দুড়্দুড়্ করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলই একটা জন্তুর মতো হু হু করিয়া চীৎকার করিতেছে।

এরপরেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ঘরে-বাইরে উপন্যাস। সেটি সবুজ-পত্র-এ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২২ সালের বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত। চতুরঙ্গ যেমন ভাষারীতির রূপান্তরণের দৃষ্টান্ত, তেমনি রূপবন্ধের (ফর্মের) রূপান্তরণের দৃষ্টান্তও বটে। আত্মভাষণের ভঙ্গিতে কথ্যপ্রভাবিত সাধু রীতির ভাষায় লেখা ছোটগল্পের আকারে তিনি যে-ফর্মের পরীক্ষা সুরু করেছিলেন, ভাষারীতির মতো তাও চতুরঙ্গ-এ চরম রূপ লাভ করেছিল।

চতুরঙ্গ ছোটগল্প নয়, আবার উপন্যাসও নয়, অথচ গল্প ও উপন্যাসের হাত-ধরাধরি। এরপর এই ভঙ্গিতে আর গল্প নয়, উপন্যাস লেখাই স্বাভাবিক এবং সে উপন্যাস রূপবন্ধের দিক থেকে আগের যুগের উপন্যাস থেকেও স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। অন্যদিকে তেমনি সাধু রীতিকে আঁকড়ে না-থেকে পুরোপুরি চলতি রীতির ভাষা ব্যবহারই সঙ্গত। কার্যক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

ঘরে-বাইরে চলতি ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। বিষয়-বস্তুর মতো এর ভাষারীতিও সেদিন বাংলা সাহিত্য-পাঠকদের বিস্মিত ও চমকিত করেছিল। এর ভাষার শক্তি ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না, কিন্তু ভাষার সচেতন রূপটিও চোখ এড়িয়ে যায় না। এ ভাষায় কেমন যেন স্নিগ্ধতার অভাব, অতিস্পষ্টতার নিবারণতা ; আর, এই জন্যই যেন এ ভাষায় অলংকারের এত প্রাচুর্য, সচেতনভাবে সজ্জীকরণের প্রয়াস। এ ভাষা যত না মনোহর, তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর, হৃদয়সিক্ত না-হয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত। আবার এই সঙ্গে একথাও বলতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের চলতি গদ্যের এইটিই মুখ্য বৈশিষ্ট্য—প্রথম প্রয়োগের দরুন যার আতিশয্য অপেক্ষাকৃত বেশি প্রকট। ভাবে যেমন, ভাষাতেও তেমনি "ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা" এবং "মন যাতে বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে তার চেষ্টা"।

ঘরে-বাইরে-র ভাষা গতিশীল ও বেগবান হওয়া সত্ত্বেও এতে কথ্য গদ্যের স্বভাবসিদ্ধ ক্ষিপ্রতার অভাব, অথচ এই ক্ষিপ্রতা চতুরঙ্গ-এর সাধু গদ্যে তুলনায় অনেক বেশি চোখে পড়ে। এর বাক্যের ছাঁদ সাধু ঘেঁসা, অব্যাহত প্রবহমানতা সত্ত্বেও এই কারণে অপেক্ষাকৃত মন্থরগতি। যেমন :

> সমস্ত দেশের উপর এই-যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ঠিক এই জিনিসটাই আমার জীবনের মধ্যে আর-এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। আমার ভাগ্য-দেবতার রথ আসছে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিনরাত্রি আমার বুকের ভিতর গুরু-গুরু করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল একটা কী পরমাশ্চর্য এসে পড়ল বলে, তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ? যে ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য, যে ক্ষেত্রে বিচার-বিবেক, যে ক্ষেত্রে দয়া-মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই খুলে গেছে। আমি তো একে কোনোদিন কামনা করি নি, এর জন্যে প্রত্যাশা করে বসে থাকি নি, আমার সমস্ত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখো এর জন্যে আমার তো কোনো জবাবদিহি নেই। এতদিন একমনে আমি যার পূজা করে এলুম বর দেবার বেলা এ যে এল আর-এক দেবতা। তাই, সমস্ত দেশ যেমন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছে 'বন্দে মাতরং' আমার প্রাণ তেমনি করে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়ে তুলেছে 'বন্দে'—কোন্ অজানাকে, অপূর্বকে, কোন্ সকল-সৃষ্টি-ছাড়াকে!

ঘরে-বাইরে-র ভাষা যেখানে সচেতনতাকে অতিক্রম করে হৃদয়সিক্ত অর্থ-গূঢ়তা সঞ্চার করতে পেরেছে এবং আবেগের তীব্রতায় প্রবল গতিবেগ ও ক্ষিপ্রতা অর্জন করেছে—তার একটু দুর্লভ দৃষ্টান্ত দিই। এখানে অলংকার আর ভাষার সজ্জা নয়, স্বভাবেরই অঙ্গীভূত। এ থেকেই রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার মহিমোজ্জ্বল বীরকান্ত রূপটি চেনা যাবে :

> দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম-দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত শজনেগাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সেই সূর্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুইভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল, একটা প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো—তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে-থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা যেন হু হু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্যে।
>
> অন্ধকার হয়ে এল। দূর-গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠতে থাকে তেমনি বহুদূর থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন কেঁপে উঠতে লাগল।

ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠল। আমি জানি মেজরানী সেই ঘরে গিয়ে জোড়হাত করে বসে আছেন। আমি এই রাস্তার ধারের জানলা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে পারলুম না। সামনেকার রাস্তা, গ্রাম, আরও দূরেকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপসা হয়ে এল। রাজবাড়ির বড়ো দিঘিটা অন্ধের চোখের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের ফটকের উপরকার নবতখানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী-যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।

রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কত রকমের ছদ্মবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথায় একটা ডাল নড়ে, মনে হয় দূরে যেন কে ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল, মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস করে ওঠার শব্দ।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের কালো গাছের সারের নিচে দিয়ে আলো দেখতে পাই, তারপরে আর দেখতে পাই নে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনি, তার পরে দেখি ঘোড়সওয়ার রাজবাড়ির গেট থেকেই বেরিয়ে ছুটে চলছে।

কেবলই মনে হতে লাগল, আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা দিক থেকে মারতে থাকবে। মনে পড়ল সেই পিস্তলটা বাক্সের মধ্যে আছে। কিন্তু এই পথের ধারের জানলা ছেড়ে পিস্তল নিতে যেতে পা সরল না, আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছি।

রাজবাড়ির দেউড়ির ঘণ্টায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল।

ঘরে-বাইরে রচনার পর রবীন্দ্রনাথ বারো বছর কোনো উপন্যাস রচনায় হাত দেন নি, এমন কি এই বারো বছরে গল্প লিখেছেন অতি সামান্য—মাত্র চারটি, তার মধ্যে একটি (তপস্বিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪, সবুজপত্র) সাধু ও চলতি মিশ্রভাষায় অর্থাৎ সাধু বর্ণনায় এবং কথোপকথনে চলতি। এরপর আর তিনি কখনো সাধুভাষা ব্যবহার করেন নি। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন ভ্রমণকালীন পত্র—১৩২৩ সালে জাপান-যাত্রী, ১৩৩১ সালে

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি, ১৩৩৩ সালে পথে ও পথের প্রান্তে এবং ১৩৩৪ সালে জাভাযাত্রীর পত্র। এই বারো বছরের পত্রসাহিত্যের ঠিক মধ্যবর্তী সময়ে ১৩২৯ সালে (আগস্ট, ১৯২২) রচিত হয় এযুগের স্মরণীয় গদ্যগ্রন্থ লিপিকা।

লিপিকা-য় নতুন ভঙ্গিতে লেখা আটত্রিশটি 'কথিকা' আছে। কয়েকটির মধ্যে বস্তুর ক্ষীণসূত্র ধরে আত্মগত ভাবনার প্রকাশ, বেশির ভাগের মধ্যে গল্পের সূত্র স্পষ্ট। এগুলিকে গল্পাণু বা গল্পকণা নামে আখ্যাত করাই সঙ্গত। "এগুলি নূতন রীতিতে লেখা গল্পের রেখা-চিত্র, মনের ভাবনার নিরাভরণ আল্পনা যেন।" বিশ্বসাহিত্যে লিপিকা-র অনুরূপ রচনা তুর্গেনেভের গদ্যকবিতাগুলি। তুর্গেনেভ তাঁর গদ্যকবিতাগুলি পাঠ সম্পর্কে ভূমিকায় যে-কথা বলেছিলেন, লিপিকা-র কথিকাগুলি পাঠ সম্পর্কেও সেই একই কথা বলা চলে: "পাঠক, এই গদ্যকবিতাগুলিকে একটানা পড়ে যাবেন না। তাতে মনে হবে একঘেয়ে, হাত থেকে বই খসে পড়বে। একসঙ্গে মাত্র একটিই পড়বেন, আজ একটা, কাল আর একটা। হয়তো তাহলেই, এদের কোনো একটা হৃদয়ে রেখাপাত করবে, হয়তো কোন বীজ বপন করবে যা একদিন ফল হয়ে ফলে উঠবে।"—ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা।

লিপিকা-র রচনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ দশ বছর পরে পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবিতা বলে দাবি করেছেন, এগুলি লেখা হয়েছিল গদ্যের কাব্যশক্তির পরীক্ষার প্রয়োজনে। তিনি লিখেছেন: "গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলুম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যচ্ছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে ইংরেজির মতোই বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেন নি। তখন আমি পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধকরি ভীরুতাই তার কারণ।"

'কবিতার রস দেওয়া'র সচেতনতার জন্যই লিপিকা-র গদ্যরীতিতে অভিনবত্বের সৃষ্টি হয়েছে। অভিনবত্ব সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে বাক্য-বিন্যাসের ভঙ্গিতে। বাক্যগঠনে পদ বা পদাংশ, বিশেষ করে ক্রিয়াপদ,

গদ্যের সাধারণ রীতি লঙ্ঘন করে বহু ক্ষেত্রে আগে এসেছে, বাক্য সমাপ্ত হয়েছে অসমাপিকায়। বাক্যের প্রারম্ভে বাক্যের ক্রিয়াপদ, যেমন :

এই তো পায়ে চলার পথ।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে বটতলায়।—পায়ে চলার পথ।

রোজই থাকে সমস্তদিন কাজ, আর চারি দিকে লোকজন।—মেঘলা দিনে।

অসমাপিকায় বাক্য শেষের দৃষ্টান্ত :

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে, মাটির কাছে ধরা দেবে বলে। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।—বাণী।

কিন্তু পদের এই স্থানপরিবর্তন কোনো ভঙ্গিমায় পরিণত হয় নি ; ছন্দের প্রবাহপথে শব্দবিন্যাসের ধর্ম অনুসারে স্বাভাবিক রূপেই দেখা দিয়েছে। সাধারণভাবে বাক্যগুলিতে ক্রিয়াপদ একেবারে অন্তেই ব্যবহৃত হয়েছে। গদ্যের কাঠামোয় কোনো বিপর্যয় না ঘটিয়ে চলতি গদ্যের বাক্যচ্ছন্দের অতি-তালকে, পদ্যের মতো 'অতিনিরূপিত' না হোক, অনেকখানি নিরূপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং তাতে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য ফল লাভও করেছেন। বহুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ শোকের আবেগে সাধু গদ্যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন পুষ্পাঞ্জলি-র রচনাগুচ্ছে। সেগুলিকেও গদ্যে লেখা গীতিকবিতা বলা হয়েছে। কিন্তু লিপিকা-র কথিকাগুলির সঙ্গে তাদের ভাব ও রূপগত সাদৃশ্য একেবারেই নেই। এগুলির মধ্যে আছে ভাষার লঘুতা ও ক্ষিপ্রতা, কিন্তু তারই সঙ্গে ভাবের গভীরতা ; আর আছে পরিমিতিবোধ ও মিতভাষিতা। গদ্যের বাক্যবন্ধের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেও গীতি ও ছন্দোময়তা সৃষ্টির সুন্দরতম নিদর্শন সন্ধ্যা ও প্রভাত।

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের

কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ; কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে ; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

যে-সব কথিকাগুলিতে কাহিনীর সূত্র আছে, তাদের ভাষাদেহ অতি লঘু, ছোট ছোট বাক্যগুলি যেন শরতের মেঘের মতো তূর্ণগতি, ভারহীন লঘুদেহে গভীর অর্থময়তা। ছন্দের স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও এগুলির ভাষাকে গল্প-উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় প্রয়োগ করতে খুব বেশি অসুবিধে হয় বলে মনে হয় না। সে ভাষার নিদর্শন দিই :

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝগগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতের সুরে ঝিমি ঝিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা পরে হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢুকল ; পরী-বৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় সাদা আস্তরণ, তার উপর সাদা কুন্দফুল রাশ-করা ; আর উপরে জানলা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে। আর,

আর, কাজরী ?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। একে একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল।

পরী কই।

রাজপুত্র বললে, "চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।"—পরীর পরিচয়।

চলতি ভাষায় লেখা দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপন্যাস যোগাযোগ ও শেষের কবিতা পর পর রচনা। যোগাযোগ প্রথমে তিন পুরুষ, পরে যোগাযোগ নামে ১৩৩৪ সালের আশ্বিনমাস থেকে বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, শেষের

কবিতা পরের বছর প্রবাসী পত্রিকায়। ফর্মের দিক থেকে যোগাযোগ সাধু ভাষায় লেখা উপন্যাসগুলির সমগোত্রের। গোরা ছাড়া এত বড় উপন্যাস তিনি আর লেখেন নি। এই বৃহৎ উপন্যাসটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার বলিষ্ঠতম রূপ প্রকাশিত। ভাষা সরল ও অপেক্ষাকৃত অলংকার-বাহুল্যহীন। যোগাযোগ-এর ভাষাকে নিছক চারু ও সুন্দর বললে অবিচার করা হয়। এর মধ্যে কথ্য ভঙ্গি সর্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং সে ভঙ্গিতে জীবনের গভীরতম ট্রাজেডিকে প্রকাশ করতে বাধা ঘটে নি। সরল হলেও ভাষায় তরলতার চিহ্নমাত্র নেই, আছে একধরনের নমনীয় দার্ঢ্য, কোমলে-কঠিনে-মেশানো ইস্পাতের মতোই কঠিন ধারালো অথচ লঘুদেহ ও ঘাতসহ। গোরা-র সাধু গদ্যের সঙ্গে যোগাযোগ-এর ভাষার সংহত ও সংযত মূর্তিতে অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির মাধ্যমে এই ভাষার বৈশিষ্ট্যটি দেখানো সম্ভব নয়, কারণ এর সৌন্দর্য সামগ্রিক প্রয়োগ-কুশলতায়। তবু একটু দৃষ্টান্ত দিই :

> সেদিন সকালে অনেকক্ষণ ধরে কুমু তার দাদার ঘরে বসে গান বাজনা করেছে। সকালবেলাকার সুরে নিজের ব্যক্তিগত বেদনা বিশ্বের জিনিস হয়ে অসীমরূপে দেখা দেয়। তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। সাপগুলো যেন মহাদেবের জটায় প্রকাশ পায় ভূষণ হয়ে। ব্যথার নদীগুলি ব্যথার সমুদ্রে গিয়ে বৃহৎ বিরাম লাভ করে। তার রূপ বদলে যায়, চঞ্চলতা লুপ্ত হয় গভীরতায়। বিপ্রদাস নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, "সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয় কুমু, চিরকালটা থাকে আড়ালে; গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।"
>
> এমন সময়ে খবর এল, মহারাজ মধুসূদন এসেছেন।
>
> এক মুহূর্তে কুমুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল; তাই দেখে বিপ্রদাসের মনে বড়ো বাজল, বললে, "কুমু, তুই বাড়ির ভিতরে যা। তোকে হয়তো দরকার হবে না।"
>
> কুমু দ্রুতপদে চলে গেল। মধুসূদন ইচ্ছে করেই খবর না দিয়েই এসেছে। এ পক্ষ আয়োজনের দৈন্য ঢাকা দেবার অবকাশ

> না পায় এটা তার সংকল্পের মধ্যে। বড়ো ঘরের লোক বলে বিপ্রদাসের মনের মধ্যে একটা বড়াই আছে বলে মধুসূদনের বিশ্বাস। সেই কল্পনাটা সে সইতে পারে না। তাই আজ সে এমনভাবে এল যেন দেখা করতে আসে নি, দেখা দিতে এসেছে।

ভাবে যেমন ভাষার ভঙ্গিতেও তেমনি শেষের কবিতা (১৩৩৬) যোগাযোগ থেকে স্বতন্ত্র। শেষের কবিতা-র ভাষা অনেক বেশি চতুর ও সচেতন। এই উভয় বৈশিষ্ট্যই এসেছে সমগ্র উপন্যাসে অনুসৃত তির্যকবর্ণনভঙ্গি থেকে, যার মধ্যে হিউমার আছে, ব্যঙ্গ আছে, প্যারডিও আছে। আর আছে একধরনের "সফিস্ট্রি"—অতিপ্রসাধনে, অতিরঞ্জনে যা অতিসহজেই অবাক করে দেয়। এই ভাষার সাবলীলতা ও তীক্ষ্ণতার তুলনা হয় না। ভাষা যেন পাহাড়ী ঝরনার স্ফটিক-স্বচ্ছ ধারার মতো কলধ্বনিত, যার মধ্যে "আকাশের সমস্ত আলোই প্রতিবিম্বিত হয়"। এ ভাষায় গভীরতার অভাব, কিন্তু অগভীর স্বচ্ছতাই যেন এ ভাষার সৌন্দর্য। দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি :

> ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর কারও আপত্তি থাকতে পারে অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা কয়। সেইজন্যে তার প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য বললে, "চলুন"।
>
> ঘনবনের ছায়া। সরু পথ নেমেছে নিচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝরনার ধারা এক জায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকারচিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজনে বসল। ঠিক সেই জায়গায় খাদটা গভীর হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দার ছায়ায় একটি পর্দানশীন মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তার ভয়। এখানকার নির্জনতার আবরণটাই লাবণ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগল। সামান্য যা তা একটা কিছু বলে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আসছে না, স্বপ্নে যেরকম কণ্ঠরোধ হয় সেই দশা।

যোগাযোগ-এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী আর সাধারণ স্তরের নয়, তাদের জীবনযাত্রা ও বিচরণস্থল সমাজের উচ্চমঞ্চের সীমিত পরিবেশে, তাদের কথাবার্তা তাই মার্জিত, অতিপরিচ্ছন্ন ও দীপ্তিময়। শেষের কবিতা-য় এদের প্রথম আবির্ভাব। এইসব পাত্র-পাত্রীর ব্যবহৃত মুখের ভাষাকেই রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন অতিনৈপুণ্যে, শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে। সেদিক থেকে শেষের কবিতা-র ভাষা বাস্তবতার ভাষা। কিন্তু এইসব অ-সাধারণ পাত্র-পাত্রীর জীবনের বাস্তবতার মতোই এ ভাষার সীমাবদ্ধতাও অগোচর থাকে না। যত প্রসাধন, যত অলংকরণ, যত গীতিমাধুর্যের প্রলেপ—সবই যেন ওই অতিনাগরিকতার সীমাবদ্ধতাকে আড়াল করার চেষ্টা। তার ফলে একটা ভঙ্গিমা, একটা সচেতন হস্তলেপের প্রয়াস যেন সব সময়েই উদ্যত হয়ে থাকে। অবিশ্রান্ত নিটোল মসৃণ বাক্যের কলধ্বনি, ঝকমক-করা কথার ফুলঝুরি; শব্দ ও অর্থের বিচিত্র রোশনাই; মন চমকে দেয়, চোখ ঝলসে ওঠে। শব্দার্থ-সাধনার সিদ্ধির এ এক অভিনব প্রকাশ। শব্দ-অর্থের কত অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী হলে তবে সজ্ঞানে এমন করে দুহাতে ছড়ানো সম্ভব। কিন্তু প্রসাধন ও সচেতন বাক্-বৈদগ্ধ্যের এই খরদীপ্তিও মুছে গিয়ে মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অগোচরে এই ভাষায় আবার স্নিগ্ধ জ্যোতির্লেখা বিকীর্ণ হয়েছে, যেখানে পাত্র-পাত্রীর সীমিত জীবন তাদের গণ্ডি অতিক্রম করেছে, যেমন কেটি মিটারের আংটি ফেরানোর দৃশ্যে:

> আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আংটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংলণ্ডে। অক্‌স্‌ফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি যুবক ছিল কেটির প্রণয়-মুগ্ধ। সেদিন আপোষে অমিত সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল। অমিতেরই হল জিত। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সেই ক্ষণে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে। তার মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিল কিন্তু

> কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি, তার হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না। আংটি হাতে পরা হলে অমিত তার কানে কানে বলেছিল—
>
> Tender is the night
>
> And haply the queen moon is on her throne.
>
> কেটি তখন বেশি কথা বলতে শেখে নি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে মনে বলেছিল "মন আমি", ফরাসি ভাষায় যার মানে হচ্ছে, 'বঁধু'।
>
> আজ অমিতের মুখেও জবাব বেধে গেল। ভেবে পেলে না কী বলবে।
>
> কেটি বললে, "বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্, অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।"
>
> বলে আংটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

শেষের কবিতা-র ভাষা তখনকার দিনের তরুণ লেখকদের মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তা বর্ণনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। ঐতিহাসিক বিচারের দিক থেকে তাঁর বর্ণনাটি মূল্যবান। তিনি লিখেছেন:"...সে-সময়ে যেটা আমাদের মনে সবচেয়ে চমক লাগিয়েছিলো সেটা শেষের কবিতার ভাষা। অমন গতিশীল, অমন দ্যুতিময় ভাষা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আমরা পড়ি নি।..... বাংলা গদ্য এত সাবলীল হতে পারে, তাকে যে ইচ্ছে মতো বাঁকানো, হেলানো, দোমড়ানো, মোচড়ানো সম্ভব, আলো-ছায়ার এত সূক্ষ্ম স্তর তাতে ধরা পড়ে, খেলা করে ছন্দের এত বৈচিত্র্য, তা আমরা এর আগে ভাবতেও পারি নি। তাই এই বইটি হাতে পেয়ে যদি আমাদের মনের অবস্থা চ্যাপম্যানের হোমর পাঠান্তে কীটসের মতো হয়ে থাকে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

"আর, যদি গদ্যরচনার কারুশিল্পই আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে দেখতে পাবো শেষের কবিতা বাংলা সাহিত্যে চূড়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাংলা গদ্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতির মূলে অনেকখানি রয়েছে এই গ্রন্থের প্রভাব; ......ঘরে বাইরেতে যে-পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিলো তার উদ্‌যাপন হলো শেষের কবিতায়; ......রচনার মধ্যে ক্রিয়াপদের সংখ্যা হ্রাস, কথ্যভাষার ভাণ্ডার থেকে নতুন ক্রিয়াপদ ও অন্যান্য শব্দসংগ্রহ, বাক্যবিন্যাসে মাঝে মাঝে ব্যুৎক্রম ঘটিয়ে ভাষার ছন্দে বৈচিত্র্যসাধন—এই সব নিয়ম, যা বাদ দিলে আজকের দিনে এক দণ্ডও চলে না আমাদের, এগুলো ঘরে-বাইরেতে প্রবর্তিত হলেও প্রতিষ্ঠিত হলো শেষের কবিতায়। বহু দিনের বহু পরীক্ষার পর শেষ ফলটি যেখানে এসে পাওয়া যায়, সেখানেই আমরা বিশেষ সম্মান দিয়ে থাকি; সেদিক থেকে এই গ্রন্থকে বাংলা গদ্যের মুক্তিদাতা বললে ভুল বলা হয় না।......"

শেষের কবিতা-র পর প্রায় চার বছর রবীন্দ্রনাথের কোনো উপন্যাস বা ছোটগল্পের সৃষ্টি হয় নি। এই সময়ে তিনি কানাডায় জাপানে ইউরোপে ঘুরেছেন, রাশিয়ায় গিয়েছেন, পারস্য-ইরাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে রাশিয়ার চিঠি (১৩৩৮), দেশের হিন্দু-মুসলমান -সমস্যা, সাহিত্যতত্ত্ব ও আধুনিক সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু উপন্যাস-গল্পের সাক্ষাৎ নেই। তার কারণ হিসাবে বলা চলে, শেষের কবিতা থেকেই "মাটির সঙ্গে কবির স্বাভাবিক বাঁধন...যেন অবলুপ্ত।" জীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় অতিপরিচিত শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় বিপুল প্রাণলীলায় স্পন্দিত পৃথিবী যেন তার পর থেকে অগণিত খণ্ড-দৃশ্যের রেখাচিত্রের মতো অসংখ্য ঘটনার সুখ-স্মৃতির মতো তাঁর চোখে ভেসেছে, মনে জেগেছে। এই অবস্থায় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সমৃদ্ধ সুসংবদ্ধ উপন্যাস লেখা বা সংহত সুসম্পূর্ণ ছোটগল্প লেখা, বোধ হয়, স্বাভাবিকও নয়। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর চলতি গদ্য নিয়ে নতুন এক সৃষ্টির পরীক্ষায় মন দিয়েছিলেন।

এই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১৩৩৯ সালের মাঝামাঝি থেকে, পরিশেষ কাব্যগ্রন্থে যার কিছু নমুনা আছে, পুনশ্চ গ্রন্থে যা পরিপূর্ণ আকারে আত্মপ্রকাশ

করেছে। রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে "গদ্যকাব্য" বলেছেন, এদের মধ্যে তিনি "অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন"ই শুধু ভাঙেন নি, পদ্যকাব্যের "ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করে গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে এদের সঞ্চরণ" স্বাভাবিক করে তুলেছেন এবং এদের বিনা দ্বিধায় কবিতা আখ্যাত করেছেন। কিন্তু এদের যা খুসি নাম দেওয়া হোক, এরা যে এই সময়ের চলতি গদ্যরচনারই আর এক পর্যায়মাত্র, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বিচিত্র খণ্ড-দৃশ্য, ঘটনা বা কাহিনীর রূপরেখা এই ধরনের গদ্যভঙ্গিতে প্রকাশ না করে অন্য কোনো ভঙ্গিতে প্রকাশ সম্ভবপর ছিল বলে মনে হয় না। যা বস্তু হয়েও বস্তুভারহীন, যা ভাব হয়েও আকারহীন নয়, তাকে প্রকাশ করতে বোধহয় এমনই গদ্যের মাধ্যম প্রয়োজন ছিল। পুনশ্চ-এর কবিতাগুলিকে (যদি কবিতার মতো সাজানো পর্বগুলিকে) ভেঙে গদ্যের মতো বাক্যপরম্পরায় সাজানো যায়, তাহলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, কবিতার মতো পর্বসজ্জাটা নিছক চোখ-ভোলানোর চেষ্টা মাত্র। পুকুর ধারে কবিতা থেকে দৃশ্যবর্ণনার একটি দৃষ্টান্ত দিই:

> দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে পুকুরের একটি কোণা। ভাদ্রমাসে কানায় কানায় জল। জলে গাছের গভীর ছায়া টল্‌টল্ করছে সবুজ রেশমের আভায়। তীরে তীরে কলমি শাক আর হেলঞ্চ। ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছ কটা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এধারের ডাঙায় করবী, সাদা রঙন, একটি শিউলি; দুটি অযত্নের রজনীগন্ধায় ফুল ধরেছে গরিবের মতো। বাঁখারি-বাঁধা মেহেদির বেড়া, তার ওপাড়ে কলা পেয়ারা নারকেলের বাগান; আরো দূরে গাছপালার মধ্যে একটা কোঠাবাড়ির ছাদ, উপর থেকে শাড়ি ঝুলছে। মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো গা-খোলা মোটা মানুষটি ছিপ ফেলে বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঠাতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে।
>
> বেলা পড়ে এল। বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ, বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা। ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে, টলমল করছে পুকুরের জল, ঝিল্‌মিল্ করছে বাতাবি লেবুর পাতা।

কিংবা প্রথম পূজা কবিতার কাহিনীর বর্ণনা :

> ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির। লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তার ভিত-পত্তন করেছিলেন কোন্ মান্ধাতার আমলে, স্বয়ং হনুমান এনেছিলেন তার পাথর বহন করে। ইতিহাসের পণ্ডিত বলেন, এ মন্দির কিরাত জাতের গড়া, এ দেবতা কিরাতের।

লিপিকা-র কথিকাগুলির মতোই কাব্যত্বের দিকে নজর রেখে এগুলি লেখা হয়েছিল, তাই বাক্যবিন্যাসে ঈষৎ পদ্যঘেঁষা পদবিন্যাসভঙ্গির স্পর্শ অবশ্যই আছে। কিন্তু এই সময়ে লেখা (অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৩৩৯) উপন্যাস দুই বোন-এর গদ্য থেকে গদ্যকবিতাগুলির পার্থক্য মূলগত নয়। দুই বোন-এর গদ্যের একটু নমুনা কবিতার মতো খণ্ডিত করে সাজিয়ে দেখাই :

দিন গেছে। রাত্রি হয়েছে অনেক।
পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখাজাল ছাড়িয়ে
পূর্ণচাঁদ উঠেছে অনাবৃত আকাশে।
হঠাৎ ফাল্গুনের দমকা হাওয়ায়
ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে দোলাদুলি করে উঠেছে
বাগানের সমস্ত গাছপালা,
তলাকার ছায়ার জাল তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।
জানলার কাছে উর্মি চুপ করে বসে।
ঘুম আসছে না কিছুতেই।
বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয় নি।
আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে।
আজ বসন্তে মাধবীলতার মজ্জায় মজ্জায়
যে ফুল ফোটাবার বেদনা
সেই বেদনা যেন উর্মির সমস্ত দেহকে
ভিতর থেকে উৎসুক করেছে।
পাশের নাবার ঘরে গিয়ে মাথা ধুয়ে নিলে,
গা মুছলে ভিজে তোয়ালে দিয়ে।

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে
কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নজড়িত ঘুমে
আবিষ্ট হয়ে পড়ল।

এখানে একটি শব্দেরও স্থানপরিবর্তন করা হয় নি, নির্ভেজাল গদ্য রূপেই উপস্থিত করা হয়েছে। স্পষ্টই দেখা যায়, যাদের কবিতা বলা হয়েছে তাদের থেকে এর ভাষাভঙ্গির পার্থক্য অতি নগণ্য, ব্যাকরণের কোনোই পার্থক্য নেই। দুই বোন-এর পরের বছরের (আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৪০) লেখা মালঞ্চ উপন্যাসের ভাষাভঙ্গি গদ্যকবিতাগুলির আরো কাছাকাছি, গদ্যের পদবিন্যাসরীতির কাঠিন্য ছন্দের দোলায় একেবারেই যেন কোমল হয়ে উঠেছে। যেখান থেকে খুসি যে-কোনো একটি লাইন থেকেই এটি বুঝতে পারা যায়। যেমন :

> ঘরের সব আলো নেবানো। জানলা খোলা, / জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়, / পড়েছে নীরজার মুখে, / আর আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্নম গুচ্ছের উপর। / বাকি সমস্ত অস্পষ্ট। / বালিশে হেলান দিয়ে নীরজা অর্ধেক উঠে বসে আছে, / চেয়ে আছে জানলার বাইরে। / সেদিকে অরকিডের ঘর পেরিয়ে সুপুরি গাছের সার। /

এর পরে লেখা চার অধ্যায় উপন্যাসের ভাষায় সে-কাঠিন্য কিছুটা যেন ফিরে এসেছে, তার কারণ সম্ভবত উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। চার অধ্যায়-এর ভাষার শিল্পকর্ম সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মকে লঙ্ঘন করে, নতুন শব্দ সৃষ্টি করে, সাধু ও অসাধু শব্দ মিশিয়ে চলতি গদ্যের ধারণ ও গ্রহণ-ক্ষমতার যেন চরম পরীক্ষা করা হয়েছে। উপন্যাস হলেও চার অধ্যায় সংলাপ-প্রধান। সংলাপের ভাষাকে ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী করতে চলতি ভাষাকে আরও কঠিন, আরও নমনীয় করতে হয়েছে। উপন্যাসের বিষয়বস্তু বস্তুভারাক্রান্ত হলেও আদ্যন্ত প্রেমের বৃত্তান্তটি কাব্যসুষমামণ্ডিত। এবং এইজন্যই এর ভাষায় অপেক্ষাকৃত কাঠিন্য সত্ত্বেও এমন কোমলতা। বর্ণনাত্মক অংশকে প্রাধান্য না-দিয়ে সংলাপকে প্রধান করে তোলার উদ্দেশ্য কাব্যময় প্রেমের বৃত্তান্তটিকে গুরুত্ব দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন : "অন্ত আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া

রচনা—নবেলের নির্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয়তো দেরি হবে।" "নির্জলা আবহাওয়ায়" ফুলের তোড়ায় জলসেকের জন্যই ভাষায় এতো কারুকর্ম। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়: "চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু। সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিষটাকে পায় সেটা ঠিক গদ্যের বাহন নয়।" চার অধ্যায়-এর ভাষার কঠিন-কোমল হীরকদ্যুতির দৃষ্টান্ত দিই বর্ণনা-সংলাপে মিশ্রিত একটি অংশ থেকে, যেখানে বাক্যের ক্ষিপ্রতা, তীক্ষ্ণতা, ঔজ্জ্বল্য ও নাটকীয়তা জাদুমন্ত্রে এক অবিচ্ছিন্ন শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে:

> দুজনে ছাদের মেঝের উপর বসল। অতীন অবার সুরু করলে। "সেদিনকার জন্মদিন চলতে লাগল একটানা, কেউ নড়বার নাম করে না। আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি, ওটা একটা ইঙ্গিত রাত-কানাদের কাছে। শেষকালে তোমাকে বললুম, সকাল সকাল তোমার শুতে যাওয়া উচিত, এই সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছ। —প্রশ্ন উঠল, 'কটা বেজেছে?' উত্তর 'সাড়ে দশটা'। সভা ভাঙবার দুটো-একটা হাইতোলা গড়িমসি-করা লক্ষণ দেখা গেল। বটু বললে, বসে রইলেন যে অতীনবাবু? চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক্।—কোথায়? না, মেথরদের বস্‌তিতে, ; হঠাৎ গিয়ে পড়ে ওদের মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।—সর্বশরীর জ্বলে উঠল। বললুম, মদ তো বন্ধ করবে, তার বদলে দেবে কী?—বিষয়টা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হবার দরকার ছিল না। ফল হল, যারা চলে যাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে গেল। শুরু হল—আপনি কি তবে বলতে চান—তীব্রস্বরে বলে উঠলুম—কিছু বলতে চাই নে।—এতটা ঝাঁজও বেমানান হল। গলা ভারি করে তোমার দিকে আধ-খানা চেয়ে বললুম, তবে আজ আসি। দোতলায় তোমার ঘরের সামনে পর্যন্ত এসে পা চলতে চায় না। কী বুদ্ধি হল বুকের পকেট চাপড়িয়ে বললুম, ফাউন্টেন পেনটা বুঝি ফেলে এসেছি। বটু বললে, আমিই খুঁজে আনছি—বলেই দ্রুত চলে গেল ছাদে। পিছু পিছু ছুটলুম আমি। খানিকটা খোঁজবার

> ভান করে বটু ঈষৎ হেসে বললে, দেখুন তো বোধ করি পকেটেই আছে। নিশ্চিত জানতুম আমার ফাউন্টেন পেনটা আবিষ্কার করতে হলে ভূগোল সন্ধানের প্রয়োজন আমার নিজের বাসাতেই। স্পষ্ট বলতে হল, এলাদির সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। বটু বললে, বেশ তো অপেক্ষা করছি। আমি বললুম, অপেক্ষা করতে হবে না, যাও। বটু ঈষৎ হেসে বললে, রাগ করেন কেন অতীনবাবু, আমি চললুম।"

রবীন্দ্রনাথের চলতি গদ্যের এই ভঙ্গিটি চার অধ্যায়-এই সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। এর পর থেকে গল্প-উপন্যাসের বাইরে যা তিনি লিখেছেন—তা বিশ্বপরিচয় (১৩৪৩), কি আরও তিন বছর পরে ভাষার পরিচয়, অথবা সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ যাই হোক—তাতেই এই ভঙ্গিটি অতি স্পষ্ট। এই ভঙ্গির গদ্যের বিচিত্র প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তি দেখা দেয় নি। এই ভঙ্গিতেই প্রকাশ করেছেন উদ্ভট ও অদ্ভুত রস সে গ্রন্থে, রূপকথা-রসের ভিয়ানে ছেলেবেলা গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন স্মৃতিরস "বালভাষিত গদ্যে"। সে ভাষার একটু নমুনা দিই:

> তাসমানিয়াতে তাস খেলার নেমন্তন্ন ছিল, যাকে বলে দেখা-বিন্তি। সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিন্নির নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুঙ্কুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পাম্‌কুনি দেবী, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিন্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধটায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানিনে; কাকগুলো জমির উপর ঠোঁট গুঁজে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিন ঘণ্টা ধরে। এ তো গেল তরকারি। আর, জালা জালা ভর্তি ছিল কাঙ্‌চুটোর সাঙ্‌চানি। সে দেশের পাকাপাকা আঁক্‌সুটো ফলের ছোবড়া-চোঁয়ানো। এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইক্‌টিকুটির ভিক্‌টিমাই, ঝুড়ি ভর্তি।......

এরই পাশাপাশি ছেলেবেলা-র ভাষায় রূপকথার মোহঘন আমেজ:

> ছুটির রবিবার। আগের সন্ধ্যেবেলায় ঝিঁঝিঁ ডাকছিল বাইরের

> দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে মিট্‌মিটে আলোতে বুক করছিল ধুক্ ধুক্। পরদিন ছুটির ফাঁকে পালকিতে চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলায়, উড়ো ঠিকানায়, গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে। নিঝুম অন্ধকারের নাড়ীতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেহারাগুলোর হাঁই-হুই হাঁই-হুই, গা করছে ছম্ ছম্। ধূ ধূ করে মাঠ, বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে। দূরে ঝিক্ ঝিক্ করে কালীদিঘির জল, চিক্ চিক্ করে বালি। ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটলধরা ঘাটের দিকে ডালপালা-ছড়ানো পাকুড় গাছ।

এই ভঙ্গির গদ্যের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্যের ব্যবধানটি যেন ঘুচিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। ভাব ও রূপের মিলন-বিরহের বিচিত্র লীলারহস্যের সন্ধানী রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সময় জগৎ ও জীবন যেন ভাব-রূপের হরগৌরী-মিলনে ধরা দিয়েছিল। তাই গদ্য ও পদ্যের পার্থক্যও ঘুচে গিয়েছিল। যেন জীবনব্যাপী বাক্-সাধনার চরম সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। এই সময়কে এবং এই সময়ের মনকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন "ধ্বনিহীনতার বয়েস", "বিরলভাষার মন"। ভাষার মুখরতা, প্লাবনময়তা আর নেই, ভাষা শান্ত, ঋজু, সরল, শুভ্র—মন্ত্রের মতো অব্যর্থ। একটিই তার ভঙ্গি—তা গদ্যও নয়, পদ্যও নয়, ভাষার শেষতম ভঙ্গি—মূর্তিমতী পরা-বাক্। এই বাকেরই রুদ্রের ধনুতে জ্যা-যোজনাকারিণী রুদ্রাণীমূর্তির চকিত সাক্ষাৎ মেলে একেবারে শেষ গল্প তিনটিতে—বিশেষ করে ল্যাবরেটরি (আশ্বিন ১৩৪৭) গল্পে। তার দৃষ্টান্ত দিই:

> সোহিনীর মনে খটকা লাগল। ওর বিশ্বাস, মেয়েদের মনকে নোঙরের মতো শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্যে পুরুষের ভালো দেখতে হওয়ার দরকারই করে না। বুদ্ধিবিদ্যেটাও গৌণ। আসল দরকার পৌরুষের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্। সেটা তার স্নায়ুর পেশীর ভিতরকার বেতার-বার্তার মতো। প্রকাশ পেতে থাকে কামনার অকথিত স্পর্ধারূপে।
>
> মনে পড়ল, নিজের প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস। ও

> যাকে টেনেছিল কিংবা যে টেনেছিল ওকে, তার না ছিল রূপ, না ছিল বিদ্যা, না ছিল বংশ-গৌরব। কিন্তু কী একটা অদৃশ্য তাপের বিকিরণ ছিল যার অলক্ষ্য সংস্পর্শে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ও তাকে অত্যন্ত করে অনুভব করেছিল পুরুষমানুষ বলে। নীলার জীবনে কখন একসময়ে সেই অনিবার্য আলোড়নের আরম্ভ হবে এই ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিত না। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জ্ঞানের চর্চায়। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের জমি ছিল স্বভাবত উর্বরা। কিন্তু যে জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, সব মেয়ের তার প্রতি টান থাকে না। নীলার মনে আলো পৌঁছয় না।

এখানেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার শেষ সীমা; সাধু ও চলতির প্রায়-শতাব্দীকালের বিবাদ-বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে একটিমাত্র গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই গদ্যরীতিকে চলতি গদ্যরীতির ধ্রুবাদর্শ মনে করলে মারাত্মক ভুল করা হবে। এই রীতি একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই গদ্যরীতি, যার অনুকরণ অসম্ভব, অনুসরণ প্রবল প্রতিভাসাপেক্ষ।

নাটকের গদ্য

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির সামগ্রিক বিচার প্রসঙ্গে নাটকের গদ্য নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। গদ্য নাটকগুলি লেখা চলতি গদ্যে, তাই চলতি গদ্যের অনুশীলনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তাদের সম্পর্কও অতি ঘনিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যনাটকের সংখ্যা—কুড়িটি ছোট ছোট কৌতুকনাট্য বাদে—সাতাশখানি; তাদের মধ্যে কয়েকখানি পুরনো নাটকের নতুন রূপ হলেও—স্বতন্ত্র নাটক হিসাবে গণ্য। সমস্ত নাটকের মুদ্রিত পৃষ্ঠা সংখ্যা হাজারেরও বেশি। এই সাতাশখানির মধ্যে আঠারোখানি নাটক চতুর্থ পর্বে অর্থাৎ চলতি গদ্যের নিরঙ্কুশ রচনার পরে লেখা। এই প্রসঙ্গে কৌতূহলজনক ব্যাপার এই যে, একেবারে ১৯২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দের তপতী নাটকের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত নাটকে নাট্যনির্দেশগুলি লিখেছেন সাধু ভাষায়। নিরঙ্কুশ চলতি গদ্যের পর্বের প্রথম দিকে দেখা যায় যে, অরূপরতন নাটকের নাট্যনির্দেশে কোথাও চলতি ("ধীরে ধীরে আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল"), কোথাও সাধু ("ঠাকুরদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ")। মুক্তধারা (১৯২২) নাটকের নাট্যনির্দেশে সবচেয়ে বেশি সাধু ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে; রক্তকরবী-র (১৯২৬) ভূমিকা চলতিতে লেখা হলেও নির্দেশ সাধুতে। তপতী নাটকেই প্রথম চলতি ভাষা—কেবল ক্রিয়াপদ ও অসমাপিকায় নয়, শব্দেও পরিবর্তন—চোখে পড়ে ("দেবদত্ত ও বিক্রম ছাড়া আর সকলের প্রস্থান"; "মন্নু্র সঙ্গে নরেশ ও বিপাশার প্রবেশ" ইত্যাদি)। এর পরেও কালের যাত্রা নাটিকাতে আবার সাধুর আবির্ভাব। নাটকের এই ভাষাবৈসম্যের কারণটি সম্ভবত এই যে, মাইকেলের সময় থেকে নাটকে সাধু ভাষায় সংক্ষিপ্ত নাট্যনির্দেশ লেখার যে-রীতি বাংলা নাটকে চলে আসছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই চিরাচরিত রীতিকেই

অভ্যাসবশত অনুসরণ করে এসেছিলেন। আর তা এমনই এক সহজ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল যে, এ-সম্পর্কে সচেতন হতে বহু সময়—নিরঙ্কুশ চলতির পর্ব শুরু হবার পরও প্রায় ষোলো বছর—লেগেছিল, এবং তারপরও ছোটখাটো নাটকে তারই জের চলছিল।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ নিরঙ্কুশ চলতি পর্বের আগে লেখা নাটকের সংখ্যা—হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক বাদে—নয়। তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চলতি গদ্যে রচনার পরিমাণ সামান্য; দ্বিতীয় পর্বে মাত্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (দুই খণ্ড) এবং ছিন্নপত্র-এর পত্রাবলী; তৃতীয় পর্বে আরও কম—ব্যক্তিগত পত্র, একটি গল্প এবং শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী। সাহিত্যের বিভিন্ন মহলে সাধুরই একাধিপত্য। কিন্তু এদের সঙ্গে নয়খানি নাটককে যোগ করলে চলতি গদ্যরচনার পরিমাণ অবশ্য কিছুটা বাড়ে। সাধু গদ্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম থেকেই সচেতন ভাবে চলতি গদ্যের অনুশীলনে মন দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। গদ্যনাটককে এর সঙ্গে যোগ করলে অনুশীলনের ক্ষেত্র ও পরিধি আরও বাড়ে এবং একথা বলা চলে যে, তৃতীয় পর্বের শেষ পর্যন্ত তিনি সাধু ও চলতির অনুশীলন সমান্তরাল ভাবেই করে এসেছেন, চতুর্থ পর্বে পুরোপুরি চলতির পক্ষপাতী হওয়াটা তাঁর পক্ষে মোটেই আকস্মিক নয়।

সাধু ও চলতির সমান্তরাল অনুশীলনে রবীন্দ্রনাথের কাছে ভাষারীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে যে সমস্যা ছিল, তা দুই রীতির ক্ষেত্রে দুই রকম। সাধু রীতির যে সম্পূর্ণ একটি আদর্শ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, তাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমস্যা তাঁর কাছে ছিল মুখ্যত বৈচিত্র্য সৃষ্টির সমস্যা; কিন্তু চলতি রীতির সমস্যাটি ছিল একটি পরিপূর্ণ সর্বাবয়ব ভাষাসৃষ্টির সমস্যা। ডায়ারি বা চিঠিপত্রে এবং নাটকে যে ভাষার প্রয়োগ হয়, তা দুই বিপরীত মেরুর ভাষা—আগেরটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিক, পরেরটি নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয়বিধ ভাষা সংযুক্ত করতে পারলেই ভাষার অবয়ব-সংস্থানটি যথাযথ হয়, আর তখনই তা সর্বাবয়ব ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র গল্প-উপন্যাসের উপযোগী হয়। চিঠিপত্র-ডায়ারির বর্ণনাত্মক ব্যক্তিক ভাষাকে

সহজেই প্রবন্ধে প্রয়োগ করা যায়, চতুর্থ পর্বের ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথ তাই চলতিতে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু নাটকের মধ্য দিয়ে অনুশীলিত নৈর্ব্যক্তিক ভাষাকে সংকোচ ও দ্বিধা কাটিয়ে সফল প্রয়োগ করতে দেরি হয়েছিল। নাটকের চলতি ভাষার প্রয়োগের প্রথম স্বাভাবিক ক্ষেত্র হচ্ছে গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর উক্তিগুলি। দ্বিতীয় পর্বেই রবীন্দ্রনাথ সেই প্রয়োগের অতি সামান্য অনিয়মিত প্রচেষ্টা করেছিলেন। ১৮৯৮ সালের আগে লেখা মোট উনপঞ্চাশটি গল্পের মধ্যে সাতটি গল্পের (পোস্টমাস্টার, ঠাকুরদা, অতিথি ইত্যাদি) উক্তিগুলি চলতিতে লেখা; এগারটি গল্পের (ঘাটের কথা, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি) উক্তির ভাষা মিশ্র। গোটা তিনেক গল্পে মিশ্রণ অতি সামান্য, যেমন, ছুটি গল্পে একটিমাত্র বাক্য। এরপর থেকে আবার গল্পের ভাষা পুরোপুরি সাধু। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের উক্তিতে চলতি ভাষার সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়োগ দেখি গোরা উপন্যাসে। পুরোপুরি চলতি ভাষায় গল্প (স্ত্রীর পত্র) লেখা হয় এরও প্রায় পাঁচ বছর পরে। বেশ বোঝা যায়, প্রথমে চিঠিপত্র, নাটক, পরে প্রবন্ধ ও উপন্যাসের উক্তিতে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষাকে পূর্ণাবয়ব করে তোলারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম "গদ্যনাট্য" নলিনী প্রকাশিত হয় য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র প্রকাশের প্রায় চার বছর পরে। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-এ চলতি ভাষার যে প্রাণবন্ততা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই নাটকে তার একান্তই অভাব। নাটকের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ও মানসিকতা অনুযায়ী ভাষাকে নানা বেশে হাজির করতে পারাটা অবশ্যই অনুশীলন সাপেক্ষ এবং সে অনুশীলন পর্বের শুরু নলিনী থেকে। কিন্তু নলিনী-তে ভাষার ক্ষিপ্রতা একেবারেই অনুপস্থিত। ভাষা কাঁচা এবং অপটু; ক্রিয়াপদের একটিমাত্র রূপের সুস্থিরতা দেখা দেয় নি ("করলেম", "এলেম", তারই সঙ্গে "পেতুম", "দিতুম", "ফিরতুম" ইত্যাদি); তবে চরিত্রানুসারে ভাষাকে যথাযথ করার চেষ্টায় মৌখিক বুলির ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান চোখে পড়ে ("আয়, শীগগির করে আয়!" "ঝট করে আয়"; "মেলাই কুঁড়ি দেখেছিলাম"; বানানে যেমন, "ফুটেচে", "করচে", "নিচ্চি", "চাচ্চে"

ইত্যাদি। উপভাষিক কথ্য বৈশিষ্ট্য, যেমন—"খেলিয়ে বেড়াচ্ছে; "একবার তার সঙ্গে একটি কথা কও' সে!")।

গোড়ায় গলদ-এর প্রকাশকাল ১৮৯২, সেটা ছিন্নপত্র-এর প্রায় শেষ দিক। এর আগের বছর প্রকাশিত হয়েছে য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (প্রথম খণ্ড)। ডায়ারির ভাষার বেগবত্তা ও ছিন্নপত্র-এর সজ্জাগুণ ও পরিচ্ছন্নতা এই নাটকের ভাষায় স্পষ্ট। এই নাটকের ভাষার বড়ো গুণটি হচ্ছে সপ্রতিভতা—সুষ্ঠু শব্দব্যবহারে, বাক্যবিন্যাসে, অর্থের বক্রতায় ভাষায় আদ্যন্ত বৈদগ্ধ্য ও রুচির চিহ্ন। একটি নাতিদীর্ঘ প্রায়-স্বগতোক্তি থেকে দৃষ্টান্ত দিই:

বিনোদবিহারী। নিমাই, তুমি এমন কথাটা বললে! আমি দুর্গন্ধ পয়সার কাঙাল! ছোঃ! অভাবকে কি আমি অভাব বলে ডরাই—তা নয়, কিন্তু তার চেহারাটা অতি বিশ্রী, জীর্ণশীর্ণ, মলিন, কুৎসিত, কদাকার, হাড়-বের-করা; নিতান্ত গায়ের কাছে তাকে সর্বদা সহ্য হয় না। তার ময়লা হাতে সে পৃথিবীর যা কিছু ছোঁয় তাই দাগি হয়ে যায়, তা চাঁদের আলোই বল, আর প্রেয়সীর হাসিই বল। এতদিন আমার টাকা ছিল না, অভাবও ছিল না—বিয়ের পর থেকে দারিদ্র্য বলে একটা কদর্য মড়াখেকো শ্মশানের কুকুর জিব বের করে সর্বদা আমার চোখের সামনে হ্যাঁ হ্যাঁ করে বেড়াচ্ছে—তাকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারিনে। আসল কথা, আমার চারি দিকে আমি একটি সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য দেখতে চাই—জীবনটি বেশ একটি অখণ্ড রাগিণীর মতো হবে, তবে আমার মধ্যে যা-কিছু পদার্থ আছে তা ভালো করে প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমার এই নতুন স্ত্রীর সঙ্গে আমার পুরোনো অবস্থার ঠিক সুর মেলাতে পারছিনে, আমার কোনো জিনিস তাঁকে কেমন খাপ খাচ্ছে না, আর তাই ক্রমাগত আমাকে ছুঁচের মতো বিঁধছে। থাকত যদি আরব্য উপন্যাসের একটি পোষা দৈত্য, স্ত্রী ঘরে পদার্পণ করলেন অমনি একটি কিংকরী সোনার থালে হ্যামিল্টনের দোকানের সমস্ত ভালো ভালো গয়না এনে তাঁর পায়ের কাছে রেখে গেল, দু-জন

দাসী বসবার ঘরে মছলন্দ বিছিয়ে চামর হাতে করে দুই দিকে দাঁড়াল, চারি দিক থেকে সংগীত উঠছে, বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে—যেদিকে চোখ পড়ছে তক-তক ঝক-ঝক করছে—সে হলে এক রকম হত—আর এই এক জীর্ণ ঘরে ছেঁড়া মাদুরে উঠতে-বসতে লজ্জিত হয়ে আছি।

বেগবত্তা সত্ত্বেও গোড়ায় গলদ-এর ভাষায় ক্ষিপ্রতার অভাব আছে। সে অভাবের কারণ সম্ভবত নাটকের বিষয়বস্তু, যা নিছকই হাস্যোচ্ছল—কৌতুকরসই যার একমাত্র উপজীব্য। কিন্তু যেখানে কৌতুকরসের ভিয়ানে গভীর জীবনরসের যোগান দেওয়া হয়েছে, সেখানে ভাষার ক্ষিপ্রতা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। পাঁচ বছর পরে লেখা বৈকুণ্ঠের খাতা-র ভাষায় তার পরিচয় মেলে। এই প্রহসনটি পদ্যে সোনার তরী ও চিত্রা-র পরে এবং গদ্যে গল্পগুচ্ছ-এর প্রথম যুগের সাধু রীতির প্রৌঢ়তার যুগে লেখা। দৃষ্টান্ত দিই :

ঈশান। বাবু, খাবার এসেছে।

বৈকুণ্ঠ। তাঁকে একটু বসতে বলো।

ঈশান। বসতে বলবো কাকে? খাবার এসেছে।

কেদার। তা হলে আমি উঠি। ওর নাম কী, স্বার্থপর হয়ে আপনাকে অনেক ক্ষণ বসিয়ে রেখেছি—

বৈকুণ্ঠ। কেন, আপনি উঠছেন কেন?

ঈশান। নাঃ, ওঁর আর উঠে কাজ নেই। তামাম রাত ধরে তোমার ঐ লেখা শুনুন! (কেদারের প্রতি) যাও বাবু, তুমি ঘরে যাও। আমাদের বাবুকে আর খেপিয়ে তুলো না।

[প্রস্থান]

কেদার। ইনি আপনার কে হন?

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, আমার চাকর।

কেদার। ওঃ, ওর নাম কী, এঁর কথাগুলি বেশ পষ্ট পষ্ট।

বৈকুণ্ঠ। হা হা হা হা! ঠিক বলেছেন। তা কিছু মনে করবেন না—অনেক দিন থেকে আছে—আমাকে মানে-টানে না।

কেদার। ওর নাম কী, অল্পক্ষণের আলাপ যদিচ তবু আমাকেও বড়ো মানে না দেখলুম। কিন্তু ওর কথাটা আপনি কানে তোলেন নি—খাবার এসেছে।

বৈকুণ্ঠ। তা হোক, রাত হয় নি—এই অধ্যায়টা শেষ করে ফেলি।

কেদার। বৈকুণ্ঠবাবু, খাবার আপনার ঘরে আসে এবং এসে বসেও থাকে—ওর নাম কী, আমাদের ঘরে তাঁর ব্যবহার অন্য রকমের। দেখুন যখন কলেজে পড়তুম তখন, ওর নাম কী, খুব উচ্চ মাচার উপরেই আশালতা চড়িয়েছিলুম; তাতে বড়ো বড়ো লাউয়ের মতো দেড়-হাত দু-হাত ফলও ঝুলে পড়েছিল, কিন্তু, কী বলে, গোড়ায় জল পেলে না, ভিতরে রস প্রবেশ করলে না, ওর নাম কী, সব ফাঁপা হয়ে রইল। এখন কোথায় পয়সা, কোথায় অন্ন, এই করেই মরছি। ভিতরে সার যা ছিল সব চুপসে, ওর নাম কী, শুকিয়ে গেল।

তৃতীয় পর্বের ছয়খানি নাটকের মধ্যে চারখানিই রূপক নাটক। লঘু হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক ছাড়া কোনো প্রহসন এই পর্বে লেখা হয় নি। এই পর্বটি রবীন্দ্রনাথের সাধু ভাষার শ্রেষ্ঠ পর্ব। এই পর্বে তাঁর মনটি বিষয়ের বস্তুরূপের চেয়ে ভাবরূপের দিকেই বেশি মাত্রায় ঝুঁকেছিল। সোনার তরী ও চিত্রা-র বস্তুর রূপদর্শনে-মুগ্ধ-মনটি এই সময়ে পদ্যে যেমন, নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি-তে, তেমনি গদ্যে চোখের বালি, নৌকাডুবি-র পর গোরা উপন্যাস-এ, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীতে এবং সেই সঙ্গে নাটকগুলিতে ভাবরূপের সাক্ষাৎকারের আকাঙ্ক্ষায় অন্তর্গূঢ় হয়ে উঠেছিল। এই সময়ের এই মানসিকতাকে প্রকাশ করতে ভাষার যে সমস্যা, তিনি তার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন সাধু রীতির মধ্যেই। চিত্রা, কল্পনা-র পর তিনি ক্ষণিকা-য় চলতির একতারায় গভীর সুর বাজাবার চেষ্টা করে অতি সহজেই আবার বহুদিনের সাধা সাধুর সেতার হাতে তুলে নিয়েছিলেন। পদ্যে যেমন, গদ্যেও তিনি তেমনি অনতিশয়িত পরিমার্জিত সরল সৌম্য সাধু ভাষাকে অন্তর্গূঢ় অপ্রত্যক্ষতার বাহন করেছিলেন। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে চলতি ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এইজন্যই দেখতে পাই, এই পর্বের নাটকের চলতি ভাষার

প্রত্যক্ষতায় অপ্রত্যক্ষতার আভাস আনার চেষ্টা। প্রাত্যহিক ব্যবহারের সীমিত অর্থের শব্দাবলীতে অর্থাতীতকে ব্যঞ্জিত করার প্রেরণাতেই, মনে করি, এই পর্বে শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী রচনারও প্রয়াস। আর এই কারণেই এই পর্বের নাটকের গদ্য সরল ও গম্ভীর, তাতে চটুলতার লেশমাত্র নেই ; ভাবরূপকে আভাসিত করতে অলংকরণের প্রয়োজনও হয়েছে, কিন্তু তা ভাবদেহেরই স্বাভাবিক অলংকরণ। যেমন রাজা নাটকে :

সুদর্শনা। বলো বলো, এমনি করে বলো! আমার কাছে তোমার কথা গানের মতো বোধ হচ্ছে—যেন অনাদিকালের গান, যেন জন্ম-জন্মান্তর শুনে এসেছি। সে কি তুমিই শুনিয়েছ, আর আমাকেই শুনিয়েছ। না, যাকে শুনিয়েছ সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক সুন্দর ; তোমার গানে সেই অলোক-সুন্দরীকে দেখতে পাই—সে কি আমার মধ্যে না তোমার মধ্যে। তুমি আমাকে যেমন করে দেখছ তাই একবার এক নিমেষের জন্য আমাকে দেখিয়ে দাও-না! তোমার কাছে অন্ধকার বলে কি কিছুই নেই। সেইজন্যেই তো তোমাকে কেমন আমার ভয় করে। এই যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, যা আমার উপর ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো, তোমার দিকে তার কিছুই নেই! তবে এ জায়গায় তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে মিলব। না না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি, সেইখানেই তোমাকে দেখব।

কিন্তু সারল্য ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে এ-ভাষায় মিশেছে আশ্চর্য গতিবেগ ও স্বচ্ছতা ; এরাই এনে দিয়েছে ভাবের প্রত্যক্ষতা। এ-ভাষা গোরা-র ভাষার মতোই ওজস্বী।

একেবারে নিরাবরণ অনলংকৃত চলতির প্রসন্নমধুর রূপটি দেখা দিয়েছে ডাকঘর নাটকে। এর ভাষার সঙ্গে জীবনস্মৃতি-র সাধু ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে ; জীবনস্মৃতি-র উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে এই অংশটি মিলিয়ে পড়লেই তা

স্পষ্ট হবে :

অমল। তা আমি জানি নে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি—সে অনেকদিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না! বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে—নদীর ধারে জোয়ারির খেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে সে কেবলই আসছে—তার পরে আখের খেত—সেই খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে—রাতদিন একলাটি চলে আসছে ; খেতের মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে—নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদাখোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে—আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। যত সেই আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।

অচলায়তন ডাকঘর-এর কয়েকমাস আগে লেখা। তবে নাটকীয় ঘটনাবস্তুর জন্য এর ভাষা বেশি ক্ষিপ্র, বক্রবাক্য ব্যবহারে বেশি সপ্রতিভ। এর তিন বছর পরে লেখা হয় ফাল্গুনী, তারপরই শুরু হয় নিরঙ্কুশ চলতির পর্ব ঘরে-বাইরে থেকে।

ঘরে-বাইরে-এর পর থেকে নাটকের ভাষার আর স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশ থাকে না, কারণ, চলতি ভাষাকে পূর্ণাবয়ব করে তোলার ব্যাপারে নাটকের ভাষার ভূমিকা মূলত এইখানেই শেষ। এরপর থেকে সাহিত্যের সকল মহলে যে-চলতি ভাষার অবাধ বিচরণ, তা সম্পূর্ণ সুগঠিত পূর্ণাবয়ব ভাষা। দীর্ঘ সাতাশ বছর একটানা এই ভাষাই প্রয়োগ করা হয়েছে ; বিভিন্ন পর্যায়ে এই ভাষায় যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে, পরবর্তী নাটকগুলির ভাষাতেও তার পূর্ণ পরিচয় মিলবে।

গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কোনো গদ্য-লেখকই পদ্য-লেখক ছিলেন না। একমাত্র পদ্য-লেখক মাইকেল গদ্য লিখেছিলেন—নাটকে চলতি এবং হেক্টর বধ কাব্যে সাধু গদ্য। কিন্তু গদ্য তাঁর আত্মপ্রকাশের বাহন ছিল না, তাই পদ্যকার মাইকেলের সঙ্গে গদ্যকার মাইকেলের কোনো তুলনাই চলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে পদ্যের কোনো কথাই ওঠে না, গদ্য ছিল তাঁর একমাত্র বাহন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এমন করে একই সঙ্গে "গদ্য পদ্যের জুড়ি" কেউ হাঁকান নি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, পদ্যে যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সে কথা বলা তো বাহুল্য মাত্র। তাঁর গদ্যের ভাষা ও রীতির বিবর্তনের পরিচয় দিয়েছি, এবার সেই বিবর্তনের সঙ্গে পদ্যের ভাষা ও রীতির সম্পর্কটি বিচার করছি।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্যের রচনা শুরু হয়েছিল প্রায় একই সঙ্গে। গদ্যরচনার প্রথম পর্ব অর্থাৎ ১২৮৬ সালের ভারতী-তে য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র-ধারার আগে পর্যন্ত পদ্যরচনা হচ্ছে (জ্ঞানাঙ্কুর-এ ছাপা রচনার আগেকার ছাপা ও না-ছাপা রচনা বাদ দিয়ে) মাত্র বনফুল, কবি কাহিনী এবং ভানুসিংহের পদাবলী। রবীন্দ্রনাথ কড়ি ও কোমল গ্রন্থের আগেকার কোনো পদ্যরচনাকেই কাব্যত্বের গৌরব দিতে চান নি। তাঁর মতে, কেবলমাত্র ভাব নয়, এর আগে কাব্যের ভাষাও তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন: "কড়ি ও কোমল রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয় নি। কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে, কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল।" কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালের মাঘমাসে, কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার দ্বিতীয় পর্বের সন্ধিকাল, তিনি তখনই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত গদ্যলেখক। তিনি পদ্যের চেয়ে অনেক আগেই গদ্যকে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন।

তার কারণ বোঝা অবশ্য মোটেই কঠিন নয়। গদ্যের চেয়ে পদ্যের ভাষা ও রীতির সর্বজনীনতা একেবারেই কম। গদ্যের ভাষা ও রীতিগত সর্বজনীন আদর্শকে অনুসরণ করে বহুদূর পর্যন্ত বিচরণ করা সম্ভব, কেননা তার বিচরণ-ক্ষেত্রের কোনো গণ্ডি নেই। পক্ষান্তরে, সর্বজনীন আদর্শটি নিয়ে আধুনিক কালে পদ্যের পক্ষে দু-পা বাইরে বেরুনোই সম্ভব নয়। আধুনিক কালে পদ্যের বিচরণক্ষেত্র একমাত্র কাব্যের মহলে মহলে, তাই তাকে সব সময়েই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে হয়। আর এই জন্যই গদ্যকারের চেয়ে পদ্যকারের কাছে ভাষানির্মাণের প্রশ্নটি তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি প্রবল হয়ে একেবারে প্রথম থেকেই দেখা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের আগে এমন কোনো বড় গীতি-কবি ছিলেন না যাঁর ভাষাকে কবিজীবনের শৈশবে অনুকরণ করা চলে। মাইকেলের বাক্যচ্ছন্দে প্রবাহিত পয়ার এবং ভাষারীতি রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ করেন নি, কারণ, প্রথম দিকের বনফুল, কবিকাহিনী ইত্যাদি আখ্যায়িকা কাব্য হলেও মূলত তারা গীতিকাব্যই। সেদিক থেকে হেমচন্দ্রের কাব্য-ভাষা ও ছন্দ তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে এ সম্পর্কে বলেছেন: "তখন হেম বাঁড়ুজ্জে এবং নবীন সেন ছাড়া এমন কোনো প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন না যাঁরা নূতন কবিদের কোনো একটা কাব্য-রীতির বাঁধাপথে চালনা করতে পারেন। কিন্তু আমি তাঁদের সম্পূর্ণ ভুলে ছিলুম।" বিহারীলালের প্রত্যক্ষ প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপরে খুবই প্রত্যাশিত। বিহারীলালের আত্মমুখী সৌন্দর্যমুগ্ধ গীতিকবির মনটি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে এক সময়ে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল, তাঁর "নির্মল সুন্দর ভাষা.........কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ" রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষণীয় বস্তু হয়ে ধরা দিয়েছিল এবং পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে "আমার সেই কাব্যগুরু" রূপে আখ্যাত করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কিন্তু কয়েকটি ছন্দের ব্যবহার ছাড়া বিহারীলালের ভাষার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর খুবই কম, যে-টুকু প্রভাব পড়েছিল তা সহজেই তাঁর "রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল"। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন প্রয়াণ-এর কোনো প্রভাব স্বীকার করেন নি। এই সব কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাষা ও রীতি গড়ে

উঠতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সামনে সুকর্ষিত গদ্যের ভাষা ও রীতির একটি সুন্দর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল। ১২৮৩ সালের কার্তিকে যখন জ্ঞানাঙ্কুর-এ কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়, তার আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল-এর (প্রথম পর্যায়, বঙ্গদর্শন পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা) আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। সুতরাং বিচিত্র বিষয়ের ক্ষেত্রে গদ্যে বিচরণের পক্ষে অনুসরণযোগ্য পদাঙ্কের অভাব তাঁর ঘটে নি।

রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানীর হাট-এর সমকালীন রচনা সন্ধ্যাসঙ্গীত—যেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর কবিজীবনের প্রারম্ভ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তার দু-বছরের মধ্যে লেখা প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গান। বউঠাকুরানীর হাট-এ রবীন্দ্রনাথের সাধু গদ্যের নিজস্ব রূপটি ফুটে উঠতে শুরু করেছে, তারও আগে য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি-তে তিনি চলতি ভাষার রীতির একটা স্ট্যাণ্ডার্ড দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন; প্রবন্ধের ভাষায় কথ্যবুলি ও শব্দের মিশ্রণে যুক্তিপ্রকাশ ক্ষমতা ও স্পষ্টতা সঞ্চার করে গদ্য-প্রবন্ধ-লেখকদের মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। গদ্যের এই সাফল্যের তুলনায় পদ্যের ক্ষেত্রে ভাষার কাঁচা রূপটি বড়ই চোখে ঠেকে। এই সময়কার গদ্য ও পদ্য উভয়কেই রবীন্দ্রনাথ "ভাষাভারতীর প্রসাদ" থেকে বঞ্চিত মনে করলেও পদ্য যতটা বঞ্চিত, গদ্য তা মোটেই নয়। এই পর্বের পদ্যের ভাষারীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল কুণ্ঠিত ছিলেন, প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের পরবর্তী কালে লেখা ভূমিকায়, জীবনস্মৃতি-তে তার পরিচয় আছে। ছবি ও গান সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। ......অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্যে চলতি ভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে-সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষা ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হল।" ছবি ও গান-এর পদ্যের চলতি ভাষা অত্যন্ত অপটু। যেমন:

বিজন ঘরে বাতায়নে
সারাটা দিন আপন মনে

বসে বসে বাইরে চেয়ে দেখি,
টুপ্‌টুপ্‌ বৃষ্টি পড়ে
পাতা হতে পাতায় ঝরে,
ডালে বসে ভেজে একটি পাখী।
তাল-পুকুরের জলের 'পরে
বৃষ্টিবারি নেচে বেড়ায়,
ছেলেরা মেতে বেড়ায় জলে,
মেয়েগুলি কলসী নিয়ে
চলে আসে পথ দিয়ে
আঁধার ভরা গাছের তলে তলে!

অপটু চলতি ভাষায় আবার সাধুর মিশ্রণ ঘটায় ভাষাভঙ্গিটি অত্যন্ত খেলো হয়ে গিয়েছে:

কে জানে কী মনেতে আশ
উঠছে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস,
বায়ু উঠে শ্বসিয়া শ্বসিয়া।
ডালপালা হা হা ক'রে
বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়ে
পাতা পড়ে খসিয়া খসিয়া।—বাদল।

কিন্তু এই সময়কার সাধু রীতির ভাষায় অপেক্ষাকৃত পরিণতির ছাপ আছে। চলতি বুলি সাধুর কাঠামোয় অনেকখানি খাপ খেয়েছে। তার ফলে অপেক্ষাকৃত মসৃণতার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন:

স্তব্ধ বাদুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখা
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা।
মাঝে মাঝে পা টিপিয়া বহিছে নিশীথবায়,
গাছে নড়ে ওঠে পাতা, শব্দটুকু শোনা যায়।—নিশীথচেতনা।

কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালে। ছবি ও গান-এর পরবর্তী তিন বছরের কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ক্রান্তিকাল। এই সময়কার গদ্যে কেবলমাত্র প্রৌঢ়িমার স্পর্শই লাগে নি,

তাতে দেখা দিয়েছে ব্যঞ্জনার গূঢ়তা এবং বাহুল্যবর্জিত সরলতা। কড়ি ও কোমল-এর পদ্যেও যেন অকস্মাৎ তার প্রভাব গিয়ে পড়েছে! ছবি ও গান-এর পর রবীন্দ্রনাথের পদ্যের ভাষা ও রীতি হঠাৎ যেন পরিণতির চিহ্ন বহন করে গদ্যের পাশে এসে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তখন ছিন্নপত্র-এর চলতি ভাষার যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে। পদ্যের কাঠামোয় চলতি রীতি, বুলি ও শব্দে এমন বিশিষ্ট সরস ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, যা পদ্যে সম্পূর্ণ নতুন। যেমন:

দুনিয়ার এই মজলিসেতে এসেছিলেন গান শুনতে;
আপন মনে গুনগুনিয়ে রাগ-রাগিণীর জাল বুনতে।
গান শোনে সে কাহার সাধ্যি, ছোঁড়াগুলো বাজায় বাদ্যি,
বিদ্যেখানা ফাটিয়ে ফেলে থাকে তারা তুলো ধুনতে।
ডেকে বলে, হেঁকে বলে, ভঙ্গি করে বেঁকে বলে—
“আমার কথা শোনো সবাই, গান শোনো আর নাই শোনো।
গান যে কাকে বলে সেইটে বুঝিয়ে দেব, তাই শোনো।”—পত্র।

কড়ি ও কোমল-এর সাধু রীতির ভাষার পরিণত রূপ চোখে পড়ে বাক্যচ্ছন্দে প্রবাহিত পয়ারে লেখা সনেটগুলিতে। এগুলির ভাষা দৃঢ়পিনদ্ধ, তৎসম শব্দগুলি ভারী ও জোরালো, অথচ স্পষ্ট ও অর্থবহ। এ-যুগের সাধু গদ্য-রচনা—যেমন রুদ্ধগৃহ, পথপ্রান্তে ইত্যাদির ভাষার সঙ্গে এর সাদৃশ্য স্পষ্ট। এ-যুগের রাজর্ষি-র ভাষার অনুরূপ সরল গম্ভীর দ্রুত ধাবমান সাধু ভাষার পরিচয়ও মেলে কিছু রচনায়। তার দৃষ্টান্ত:

গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবিশশী
শূন্য ঘেরি জগতের ভিড়,
তারি মাঝে যদি ভাঙে, যদি যায় খসি
আমাদের দু-দণ্ডের নীড়,—
কোথায় কে হারাইব—কোন্ রাত্রিবেলা
কে কোথায় হইব অতিথি।
তখন কি মনে রবে দু-দিনের খেলা
দরশের পরশের স্মৃতি।—বিরহীর পত্র।

কড়ি ও কোমল সম্পর্কে ‘কবির মন্তব্যে’ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: “এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি-প্রবণতা দেখা দিয়েছে।” একথা অবশ্য এই যুগের গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। রাজপথের কথা, ঘাটের কথা, সরোজিনী প্রয়াণ, ছোটনাগপুর ইত্যাদি রচনাতেও বিচিত্র জগতের প্রতি এই বহির্দৃষ্টি-প্রবণতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আত্মমুখী মনের এই বহির্দৃষ্টি-প্রবণতা ফুটেছে সাধু গদ্যের ভাষার সরলতায়, বাক্যের বিন্যাসভঙ্গির আপেক্ষিক শিথিলতায়, ভারী ও হাল্কা শব্দের ভারসাম্যে। যেমন:

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
পরানে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস।—যৌবন-স্বপ্ন।

মানসী-তে রবীন্দ্রনাথের সাধু ও চলতি উভয় রীতির কাব্যভাষাই পরিপূর্ণ ভাবে দৃঢ় ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মানসী রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার সংখ্যা কম। পদ্যেই যেন তিনি গদ্যকর্মের বিচিত্র বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। গদ্যকে এক পাশে সরিয়ে রেখে মানসী-র কবিতাগুলি এবং এই পর্বের পদ্যনাটক ও গীতি-নাট্যের মধ্য দিয়ে তিনি যেন পদ্যের ভাষা-রীতিকেই সাজিয়ে নিয়েছেন। সাধু রীতির পয়ার ছন্দের প্রবাহিত রূপের সুন্দরতম নিদর্শন পাওয়া যায় মানসী-র মেঘদূত, অহল্যার প্রতি কবিতায়। সাধু রীতির এই পয়ার এবং পয়ার জাতীয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সমধিক প্রকটিত হয়েছে।

বাংলা ভাষার বিবর্তনের প্রাথমিক পর্বের এক মাহেন্দ্র ক্ষণে উচ্চারণ-রীতির বিশেষত্বের দরুন আত্মপ্রকাশ করেছিল পয়ার ছন্দ। এই পয়ার ছন্দের কাঠামোয় বাঁধা ভাষাই মুখ্যত বাংলা সাধু সাহিত্যের ভাষা। পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব এই যে, তার বিশিষ্ট তালের ও তানের মধ্যে চূড়ান্ত বিপরীত ধ্বনির পদগুচ্ছকেও অন্বিত করা চলে; তার প্রতিটি চরণের স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যে সহজ প্রবহমানতার গতিবেগ সঞ্চিত থাকায়

তাকে নিয়ে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর পথপরিক্রমায় অসুবিধা হয় না। তাছাড়া, তার প্রতি চরণের শ্বাসযতি ও অর্থযতির ঐক্যের জন্য, তার গেয়-বৈশিষ্ট্যকে অতি সহজেই পাঠ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা যায়। এই পয়ার ছন্দ মূলত অপভ্রংশের উচ্চারণের যে প্রকৃতি ও বাক্-পদ্ধতির উপর গড়ে উঠেছিল, তা এক সময়ে বাঙালীর মৌখিক ভাষারই অঙ্গীভূত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাসের এক বিশেষ কারণে পয়ার ছন্দের জন্মের লগ্নেই বাঙালীর সাহিত্য-সাধনার পালা সুরু হয়েছিল, যার ফলে, এই ছন্দে গাঁথা কাব্যের একটা ভাষা-রীতি বহুকাল আগেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। তারপর বাঙালীর মুখের ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি রূপান্তরিত হয়েছে, প্রাদেশিক ভাষা-ভেদের গণ্ডি বৃহত্তর হয়েছে, কিন্তু ভদ্র-সাহিত্যের ভাষা রূপে এই ভাষারীতি অপরিবর্তনীয়ই রয়ে গেছে; অপরদিকে মৌখিক বা কথ্য ভাষার ছন্দ ও রীতি লোক-সাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে ভদ্রস্থ হতে পারে নি। বাংলা কাব্যের সাধু ভাষার সঙ্গীতটুকু গদ্যে আবিষ্কার করেছিলেন বিদ্যাসাগর, তিনি সৃষ্টি করেছিলেন বাক্যচ্ছন্দ; আর সেই বাক্যচ্ছন্দই প্রাচীন পয়ারের নিস্তরঙ্গ প্রবাহে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস হয়ে দেখা দিয়েছিল। বাংলা সাধু গদ্য ও পদ্য মূলত একই ছন্দোভঙ্গি ও ধ্বনিপ্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর এই জন্যই, সাধু গদ্য যিনি আয়ত্ত করেছেন, তাঁর পক্ষে প্রবহমান পয়ার ছন্দে পদ্যরচনায় সিদ্ধিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের সাফল্যেরও কারণ হচ্ছে এই।

বাক্যচ্ছন্দে প্রবাহিত পয়ার যে গদ্যের কত কাছাকাছি, তার প্রমাণ প্রধানত হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কবিতা। তাঁদের কবিপ্রতিভা উচ্চ স্তরের ছিল না, পদ্য-কর্মের কলাবিধির সূক্ষ্ম জ্ঞানের অভাবও তাঁদের ছিল, তার ফলে, তাঁদের লেখা অধিকাংশ কবিতাই হয়েছে গদ্যলক্ষণাক্রান্ত—পদ্যে লেখা গদ্যের বিষমপ্রবাহ। আবার অন্যদিকে, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনা থেকে এমন অনেক অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা যায়, যেখানে তার ছন্দ প্রায় পদ্যের মতোই নিরূপিত। প্রকৃতপক্ষে, এই ছন্দে গদ্য ও পদ্য যেন হাত ধরাধরি করে আছে। সাধু গদ্যে অতি সহজেই পদ্যের সুর আনা যায়, আবার প্রবাহিত পয়ারে অল্পায়াসেই সুরকে বর্জন করা যায়।

গদ্য ও পদ্যের মধ্যকার রীতির গুণগত ব্যবধানটি ঘুচিয়ে পরিমাণগত করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে দীর্ঘদিন ধরে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তার প্রথম সূচনা মানসী-র নিষ্ফল কামনা কবিতায়। পয়ার ছন্দের আট ও ছয় মাত্রার অতিনিরূপিত কাঠামোকে বজায় না রেখে, পর্বগুলিকে কিছুটা অবিন্যস্ত করলেই যে পদ্যে গদ্যের একটা অস্পষ্ট ভঙ্গি ফুটে ওঠে, তার নিদর্শন এই রকম:

বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা,
এ রহস্য এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো,
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।

সমগ্র মানব তুই পেতে চাস
এ কী দুঃসাহস!

সোনার তরী ও চিত্রা ছোটগল্পের সমৃদ্ধ পর্বের ও পঞ্চভূত রচনাকালের সমসাময়িক। তখনো ছিন্নপত্র-এর যুগ শেষ হয় নি। এ যুগের গদ্য যেমন পদ্যও তেমন মসৃণ, সংগীতধর্মী ও চিত্রবহুল। সোনার তরী-র যেতে নাহি দিব, বসুন্ধরা-র ভাষার সঙ্গে এই পর্বের গল্পগুলির ভাষার কোনো পার্থক্য নেই। সোনার তরী-র তুলনায় চিত্রা-র ভাষা অপেক্ষাকৃত গাঢ়বদ্ধ, অলংকৃত এবং তৎসম শব্দবহুল। চিত্রা-য় চলতি ভাষার রচনা নেই বললেই চলে। তবে চলতি শব্দ, চলতি বাক্‌ভঙ্গি ও বুলি সাধু ভঙ্গির সঙ্গে মিলে গিয়ে ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। ভাষার এই বৈচিত্র্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই চিত্রা-র ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন।

চৈতালী এর পরে লেখা হলেও ভাষাভঙ্গিতে তা পূর্ববর্তী স্তরের অনুযায়ী, তবে অনেক বেশি সরল ও বাহুল্যহীন। এর পরের রচনা কল্পনা ও কথা ও কাহিনী-র কিছু কবিতা। এগুলির ভাষা সোনার তরী, চিত্রা-র ভাষারই আরও প্রৌঢ়, আরও কলাসম্মত রূপ। কল্পনা-র ভাষায় যেন তৎসম শব্দপ্রয়োগের

চূড়ান্ত সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে। এমন সঙ্গীতময়, ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ, গাঢ়বদ্ধ ভাষাই সাধু পদ্যের ভাষার চরম রূপ। এরপরই যে রবীন্দ্রনাথের পদ্যের ভাষার রূপ পরিবর্তন ঘটবে তা বুঝতে দেরি হয় না। রবীন্দ্রনাথের পদ্যের সাধু ভাষার মহত্তম ও বলিষ্ঠতম রূপের পরিচয় মেলে কল্পনা-র দুঃসময়, বর্ষশেষ, বসন্ত, রাত্রি ইত্যাদি কবিতায়। বর্ষশেষ থেকে তার নমুনা দিই :

এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেশহিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি,
এবার আস নি তুমি মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে—
ধন্য ধন্য তুমি !
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজ-সম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,
জয় তব জয় !

আর, তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগের নিপুণতায় কঠোর কঠিন রূপ ফুটেছে বৈশাখ কবিতায়। যেমন :

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে !
কী ভীষণ অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর
ছায়ামূর্তি তব অনুচর।

কল্পনা-র পরবর্তী কাব্যরচনার যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের তৃতীয় পর্বের আরম্ভ। তৃতীয় পর্ব মুখ্যত সাধু গদ্যের পর্ব, তার মধ্যে প্রথম দশ বছর সাধু গদ্যের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। এই পর্বকেই রবীন্দ্রনাথের সাধু গদ্যের শ্রেষ্ঠ পর্ব বলেছি। কিন্তু গদ্যে চলতিকে একেবারে বর্জন করলেও ঠিক এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষাকে কাব্যে ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করেছেন। এই পর্বে কাব্যে চলতি ভাষা প্রয়োগের বিশেষত্ব এই যে, চলতি ভাষা ও তার ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গীতিকাব্যের বাহন করে তোলার চেষ্টা

করেছেন। চলতি ভাষার ছন্দের যে কৌলীন্যের অভাব, তা তার লোকায়ত 'ছড়ার ছন্দ' নামের মধ্যেই স্পষ্ট। এই ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ সর্বাত্মক প্রয়োগ করেছেন সমগ্র ক্ষণিকা কাব্যে, এমনকি কথা-র কয়েকটি অতি গম্ভীর-ভাবদ্যোতক কাহিনী-কবিতাতেও এই ছন্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। ক্ষণিকা-র কবিতাগুলিতে এই চলতি ছন্দ গীতিচ্ছন্দের কথঞ্চিৎ আভিজাত্য লাভ করেছে। বেশ কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ ক্ষণিকা-র এই ছন্দ-রীতি সম্পর্কে লিখেছিলেন : "ক্ষণিকায় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত বাংলা ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগেঁয়ে টাট্টু ঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।" ক্ষণিকা-য় ব্যবহৃত ভাষা ও ছন্দের শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য যে আছে তাতে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ নেই। যেমন :

এমনি করে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল-বনে।
এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।—কৃষ্ণকলি।

কিন্তু একথা মানা কঠিন যে এই ভাষার "গতিশক্তি ও বাহনশক্তি পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি"। পুঁথির ভাষা বলতে এক্ষেত্রে অবশ্যই সাধু ভাষা। ক্ষণিকা-র কবিতাগুলির ভাবের তাৎক্ষণিকতার সঙ্গে চলতি ভাষার চটুল ছন্দ সুন্দর ভাবে খাপ খেয়ে আছে ; কিন্তু যখনই গভীর আবেগে উদ্বেলিত ভাব স্থায়িত্বের প্রত্যাশী হয়েছে তখন পুঁথির ভাষার ও ছন্দের সাহায্য নিতে হয়েছে, চলতি ভাষা ও ছন্দের গতিশক্তি ও বাহনশক্তিতে কুলোয় নি। যেমন, নববর্ষা কবিতায় :

ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে কবরী—
এলায়ে ?

ওগো, নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি ?
তড়িৎ-শিখার চকিত আলোকে
ওগো, কে ফিরিছে খেলায়ে ?
ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে ?

ক্ষণিকা-য় চলতি ভাষার ছন্দের শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো সন্দেহ ছিল না বলেই মনে হয়। যদি সন্দেহ থাকতো, তাহলে পরবর্তী কালে এই ছন্দকে ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ না-করার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্ষণিকা-র পর থেকে বলাকা শুরু হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছরে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে একমাত্র শিশু ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থে চলতি ছন্দ ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয় নি, সাধু রীতির ভাষা ও ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে। খেয়া-র কিছু ক্ষুদ্রায়তন কবিতায় এবং গীতাঞ্জলি, গীতালি ও গীতিমাল্য-এর কিছু গানে চলতি ভাষা ও ছন্দের প্রয়োগ অবশ্য আছে। পুঁথির ভাষার চেয়ে এ ভাষার শক্তি "অনেক বেশি" মনে না করলেও রবীন্দ্রনাথ যে এই সময়ে এই ভাষার ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগের উপযোগিতায় নিঃসন্দেহ এবং মনোহারিতায় অতিশয় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাতে অবশ্য কোনোই ভুল নেই। কথ্য বা চলতি রীতিকে তিনি নিছক ভঙ্গিবৈচিত্র্য বলে মনে করেন নি। তা না-হলে এর চটুল ছন্দে খেয়া-র মতো গভীর সুর বাজানোর চেষ্টা করতেন না।

গদ্যের মতো পদ্যেও রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষারীতির চর্চা মোটেই আকস্মিক নয়। সাধু রীতির সঙ্গে কমবেশি সমান্তরাল ভাবে একেবারে প্রথম থেকেই এই চর্চা শুরু হয়েছে। সবুজ পত্র-এর যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে গদ্যে ও পদ্যে চলতি ভাষার প্রয়োগ করেছেন। সবুজ পত্র-এর উদ্যোক্তাদের প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য ছিল চলতি ভাষার সর্বাত্মক

প্রয়োগের। তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতৈক্যও স্থাপিত হয়েছিল। সবুজ পত্র-এ পাঁচ মাসে পর পর তিনি পাঁচটি কবিতা লিখলেন (বলাকার ১—৫ সংখ্যক কবিতা) চলতি ভাষার ছন্দে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, ষষ্ঠ কবিতা থেকেই তিনি ফিরে গেলেন আবার বিশুদ্ধ সাধু ভাষার তানপ্রধান পয়ারের ছন্দে। বলাকা-র যে-কবিতাগুলিকে বিনা দ্বিধায় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতার শ্রেণীভুক্ত করা যায়—যেমন ৬, ৭, ৮, ১১, ১৩, ৩৬, ৩৭, ৪৫ সংখ্যক কবিতা—তাদের সবকটিই সাধু ভাষার ছন্দে লেখা। এদের সঙ্গে চলতি ভাষায় লেখা ১—৪, ৪৪ সংখ্যক কবিতাগুলির তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে চলতি ছন্দের কবিতাগুলিতে ধ্বনিগত বৈচিত্র্যের কত অভাব। যেহেতু ধ্বনি স্টাইলের অন্যতম উপাদান, সেইহেতু ধ্বনিবৈচিত্র্য না থাকলে স্টাইলেরও বৈচিত্র্য সম্ভব হয় না। সাধু ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি চলতির বিপরীত, তার বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। যে-কোনো ভঙ্গি যে-কোনো স্টাইলকে সাধু ভাষার ধ্বনি মূর্ত করে তুলতে সক্ষম। বাংলা গদ্য ও পদ্যের মহত্তম স্টাইলের যা-কিছু নিদর্শন তা এই সাধু রীতিতেই সম্ভব হয়েছে।

দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফোটায়ে তোল নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়॥—৭ সংখ্যক কবিতা।

এমন মহৎ সৃষ্টি একমাত্র সাধু ভাষাতেই সম্ভব। সাধু ভাষার এই ধ্বনিগত ঐশ্বর্য-বৈচিত্র্যের তুলনায় চলতি ভাষার ধ্বনি যে কত দরিদ্র, কত সীমাবদ্ধ, তা বলাকা-র যে-কোনো চলতি ভাষার ছন্দে লেখা কবিতা থেকেই প্রতীত হবে।

রবীন্দ্রনাথ ১৩২২ সালের বৈশাখ থেকে চলতি গদ্যের নিরঙ্কুশ ব্যবহার শুরু করেছিলেন। কিন্তু পদ্যে চলতি ভাষার নিরঙ্কুশ আধিপত্য ঘটতে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আরও প্রায় ষোল-সতের বছর সময় লেগেছিল। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, যখন তিনি সম্পূর্ণ সচেতন মনে চলতি গদ্যে ঘরে-বাইরে লিখছেন, সাধু পদ্যে 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি' ঠিক সেই সময়েই লেখা। তা-ছাড়াও পূরবী, মহুয়া ও পরিশেষ-এর সাধু রীতির কবিতাগুলি লেখা হয়েছে চলতি গদ্যের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের যুগেই। চলতি গদ্যের সর্বাত্মক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই যুগে সাধু ধ্বনিরীতির সঙ্গে চলতি ধ্বনিরীতির সামঞ্জস্য ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। তা না-ঘটাতে পারলে চলতি রীতি যে কাব্যে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগের উপযুক্ত হয়ে উঠবে না, মনে হয়, এই ধরনের একটা বিশ্বাস তাঁর জেগেছিল। ঘরে-বাইরে-র পর দীর্ঘ বারো বছর রবীন্দ্রনাথ কোনো উপন্যাস লেখেন নি, গল্প লিখেছেন মাত্র চারটি, যা লিখেছেন তার বেশির ভাগই পত্র। বেশ বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঘরে-বাইরে-র পরও চলতি ভাষার সুস্থির এমন একটি রীতি আয়ত্ত করতে চাইছেন যাকে রস-সাহিত্যের নির্বিবাদ বাহন করা যায়। ঘরে-বাইরে-র সাত বছর পর লেখা হয় লিপিকা। লিপিকা-তে রবীন্দ্রনাথ যে গদ্য লিখলেন তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই যে, চলতি ভাষার ধ্বনিরীতি এই প্রথম সাধু ভাষার ধ্বনির সঙ্গে অন্বিত হল। চলতি গদ্যের অতিতালকে নিরূপিত করতে পারলে গদ্যে পদ্যের মতো তালসমতা দেখা দেয়, যার ফলে গদ্য ও পদ্যের গুণগত ব্যবধানের পরিমাণ অনেকখানি কমে যায়—লিপিকা-র গদ্যের এই যে বিশিষ্টতা, এর মূলে আছে চলতি ও সাধু ধ্বনিরীতির ভারসাম্য। গদ্যের বাক্যবন্ধের মধ্যেও পদ্যের ছন্দোময়তা সৃষ্টির দৃষ্টান্তরূপে আগে সন্ধ্যা ও প্রভাত রচনাটির উল্লেখ করেছি। পদ্যের মতো এই ছন্দোময়তা অর্থাৎ পর্ব বা ইউনিটগুলি নিয়মিত হবার ফলে

যে বিশেষ তাল সৃষ্টি হয়েছে, তা যে চলতি ভাষায় সাধু ধ্বনির প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পর্ব ভাগ করে দেখাই :

এখানে নামল সন্ধ্যা।/ সূর্যদেব, / কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, /
তোমার প্রভাত হল।/
অন্ধকারে / এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, / বাসরঘরের
দ্বারের কাছে / অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ;/ কোন্‌খানে ফুটল /
ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।/

এখানে পর্বগুলি ৪, ৬ ও ৮ মাত্রার এবং ধ্বনি মূলত তানপ্রধান। চলতি শ্বাসাঘাত কখনো স্পষ্ট (যেমন, 'উঠছে,' 'ঘরের,' 'ভোর'), আবার কখনো লুপ্ত (যেমন, 'নামল,' 'ফুটল') ; ভাষা চলতি হলেও এর ছন্দ সাধু রীতির, এক কথায়, এর ধ্বনিরীতিটাই সাধু।

পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী-র পদ্যরীতি লিপিকা-র গদ্যরীতির পরিণতি। এই সময়ের মধ্যে ভাষার রীতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্যের মৌল ব্যবধান যে ঘুচিয়ে ফেলেছেন, সেকথা আগেই বলেছি। চলতি ও সাধুর ধ্বনি ও তালের আপোষ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে চলতি ভাষার সৃষ্টি করলেন তা এক অসাধারণ ঐশ্বর্য। ভাষারীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে কেবলমাত্র বিষয়বস্তু অনুসারে ভাষাদেহে স্বাভাবিক রূপান্তর ঘটিয়ে ভাবপ্রকাশের নির্বিবাদ বাহন করে তোলাটা তাঁর মতো মহৎ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

সাধু ও চলতি ধ্বনিরীতির সামঞ্জস্য বিধানই রবীন্দ্রনাথের গদ্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই তাঁর শেষ জীবনের গদ্য ও পদ্যরীতির পার্থক্য গুণগত নয়, পরিমাণগত। শ্যামলী-র পরও তিনি চিরাচরিত পদ্য-ছন্দে কবিতা লিখেছেন ; কারণ, জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত কবি রবীন্দ্রনাথের জাগরিত স্পষ্ট ও অস্পষ্ট স্মৃতি চিরাচরিত ছন্দে-তালে বাসনার সোনার আলো ছড়াতে চেয়েছে। কিন্তু গদ্য ও পদ্যের ভাষার মেলবন্ধনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ তিনি শ্যামলী-র পর্বেই করেছিলেন। এমন কি, এই সিদ্ধির ফলকে নৃত্যনাট্যের ভাষাতেও প্রয়োগের চেষ্টা

করেছিলেন। এদিক থেকে তাঁর নৃত্যনাট্যের ভাষার গুরুত্ব অপরিসাম। নৃত্যনাট্যের কথা কেবল সংগীতনির্ভরই নয়, আবশ্যিক ভাবে নৃত্যের তালনির্ভর। এই সংগীত-নৃত্যের কথাকে তিনি গদ্যের একেবারে কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেছেন। সুর ও তালনির্ভর হলেও এর প্রকাশরীতি গদ্যানুসারী—বিশেষ করে কথ্য ভঙ্গি অনুসারী। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা-র ভূমিকায় গদ্যমুখী অংশকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই পদ্য আখ্যা দিয়েছেন ("সমগ্র চণ্ডালিকা নাটিকার গদ্য ও পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে।") প্রকৃতপক্ষে, গদ্য-ছন্দে সুর ও তাল যোজনার চরম পরীক্ষা করা হয়েছে নৃত্যনাট্যে। চণ্ডালিকা-র একাধিক একক গান ছাড়াও সংলাপের ভাষার রূপ এই রকম :

প্রকৃতি। মা গো, এত দিনে মনে হচ্ছে যেন
টলেছে আসন তাঁহার।
ওই আসছে, আসছে, আসছে।
যা বহু দূরে, যা লক্ষ যোজন দূরে,
যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে,
ওই আসছে, আসছে, আসছে—
কাঁপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে ॥

মা। বল্ দেখি বাছা, কী তুই দেখছিস আয়নায় ॥

প্রকৃতি। ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে,
চারি দিকে বিদ্যুৎ চমকে,
অঙ্গ ঘিরে ঘিরে তাঁর অগ্নির আবেষ্টন—
যেন শিবের ক্রোধানলদীপ্তি!
তোর মন্ত্রবাণী ধরি কালীনাগিনীমূর্তি
গর্জিছে বিষনিশ্বাসে
কলুষিত করে তাঁর পুণ্যশিখা ॥

সঙ্গীত ও নৃত্যনির্ভরতার জন্য এখানে বাক্যে তালসমতা ঘটেছে, কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, বাক্যে গদ্যের অন্বয়গত শৃঙ্খলা কত সামান্য বিপর্যস্ত হয়েছে। সেটি আরও স্পষ্ট হবে যদি চণ্ডালিকা গদ্যনাটিকাটির ভাষার

সঙ্গে এর তুলনা করি। মূল অংশটি তুলে দেখাই। নিছক গদ্য বলে মূলে শব্দ ও বাক্যবাহুল্য আছে, তাই কেবলমাত্র সেই কটি লাইনই তুলছি যা নৃত্যের ও সংগীতের প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কুচিত রূপে নৃত্যনাট্যে স্থান পেয়েছে :

প্রকৃতি।......এতদিনে মনে হচ্ছে, টলেছে আসন, আসছে আসছে,
যা বহুদূর, যা লক্ষযোজন দূর, যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে,......
আসছে, কাঁপছে আমার বুক ভূমিকম্পে।

মা।............কী দেখছিলি তুই আয়নাতে।

প্রকৃতি।......পিছনে ঘন কালো মেঘ, বিদ্যুৎ খেলছে,......জ্বলছে
আগুন সর্বাঙ্গ ঘিরে।..... যে-পাবক দিয়ে তিনি ঢেকেছেন
আপনাকে তোর অগ্নিনাগিনী ফোঁস্ ফোঁস্ করে তাকে
ছোবল মারছে,......।

কিন্তু এমন অংশও আছে যেখানে গদ্যকে নৃত্য ও সংগীতনির্ভর করতে গিয়ে তালসমতার জন্য মূল থেকে বিশিষ্ট হবার একেবারেই প্রয়োজন হয় নি। মূলে আছে :

প্রকৃতি। সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ
ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম
কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত
বসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে,
শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে।......সমস্ত শ্রাবস্তী-
নগরে আর কি কোথাও জল ছিল না, মা। এলেন কেন
এই কুয়োরই ধারে।...আমাকে দান করতে এলেন মানুষের
তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা।......

নৃত্যনাট্যে এর গদ্যরূপ :

প্রকৃতি। ...সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, জল দাও, জল দাও, জল দাও।

শিউরে উঠল দেহ আমার, চমকে উঠল প্রাণ।
বল্ দেখি মা,
সারা নগরে কি কোথাও নেই জল !
কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,
আমাকে দিলেন সহসা
মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান ॥

কিন্তু শ্যামলী-র পর্বেই গদ্য-পদ্যের মেলবন্ধনে যে গদ্যরীতি স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল সেইটেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গদ্যরীতি। সেই রীতিতেই তিনি লিখেছেন জীবনের শেষ বৈশাখে সভ্যতার সঙ্কট :

......আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-এক দিন. অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ-মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এরই পাশাপাশি উদ্ধৃত করছি প্রায় ছয় বছর আগে (১৬ই অক্টোবর ১৯৩৫) লেখা পত্রপুট-এর তিন সংখ্যক কবিতার অংশ :

শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমার উদ্দেশে

আজ রেখে যাব আমার ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনের প্রণতি।
বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
অগণিত যুগযুগান্তরের
অসংখ্য মানুষের লুপ্ত দেহ পুঞ্জিত তার ধূলায়।
আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম,
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল-পরিচয়-গ্রাসী
নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে।

অলংকরণ

ভাববস্তুর প্রকাশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে সম্পর্কিত না-হলে অলংকরণ অসার্থক, অলংকার সৌন্দর্যহীন। অলংকারকে ব্যাপক ও সংকীর্ণ—কাব্যের নিত্য অথবা অনিত্য ধর্ম—যে-অর্থেই গ্রহণ করা হোক, তা যে "অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য" এবং "একপ্রযত্ন" তাতে বিতর্কের তিলমাত্র অবকাশ নেই। প্রকৃত অলংকার সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশিত ভাবের অঙ্গ, অলংকরণ ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন। এইজন্য অলংকরণ স্টাইলের বহিরঙ্গ কিছু নয়। এবং স্টাইলের ক্ষেত্রে তা যে কতখানি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথের গদ্য তার নিদর্শন।

শব্দ ও অর্থের বিচিত্র লীলাবিলাসে অলংকরণের ভূমিকা কতখানি তা নিঃশেষে পরিমাপ করা কখনো সম্ভবপর নয়। অলংকারকে যদি অনিত্য ধর্মরূপেও গ্রহণ করি, অর্থাৎ যদি মেনে নিই অলংকরণ কাব্যশোভার 'অতিশয়হেতু'-মাত্র, তাহলেও মহৎ রচনায় সে-অলংকার শব্দার্থেরই অভিন্ন রূপ, সেই রূপ ছাড়া রচনার মহত্ত্ব প্রকাশের আর কোনো উপায় থাকে না। অলংকারের প্রাচুর্যে সেই রূপ আরও বিলসিত হয়ে ওঠে, মহৎ বাণী হয়ে ওঠে মহত্তম। কি গদ্যে কি পদ্যে রবীন্দ্রনাথ সেই রূপের—সেই অলংকৃত বাণীরূপের রূপকার।

শব্দার্থশরীরের অলংকরণ শব্দ ও অর্থ উভয়কে ঘিরে। শব্দের অলংকরণ প্রকৃতপক্ষে ধ্বনির অলংকরণ। অর্থের অলংকরণ মূলত শব্দাশ্রয়ী হলেও তা একান্তভাবে অর্থের উপরেই নির্ভর করে। ব্যাপক দৃষ্টিতে রচনায় প্রযুক্ত অর্থময় শব্দের যে-কোনো বিশিষ্টতা—সন্ধি, সমাস, বিশেষণ, বাক্যবন্ধ ইত্যাদির যে-কোনো কিছুই—এই অলংকরণের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে। নতুন শব্দ প্রতিপদে সৃষ্টি করা চলে না, কিন্তু ভালো লেখককে সব সময়েই শব্দের নতুনত্ব বজায় রাখতে হয়। শব্দ ব্যবহারের মধ্যেই লেখকের মৌলিকত্ব প্রকাশিত হয়। এই মৌলিকত্বের যে-অংশটি ভঙ্গিগত তা খাঁটি

স্টাইলের বহির্ভূত, তাই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার সেই ভঙ্গিগত আলোচনা এখানে নিরর্থক।

শব্দালংকারের শ্রেষ্ঠত্ব অনুপ্রাসে। আবার অনুপ্রাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনুকূল অর্থের উদ্বোধনে। শ্রেষ্ঠ অনুপ্রাস যে ধ্বনিসাম্যে সৃষ্ট নিছক সঙ্গীতময়তা নয় এবং গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠ অনুপ্রাসের প্রয়োগ করা চলতে পারে—ধ্বনির অলংকারের এই মৌল বিশেষত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও ক্ষমতা যে কত প্রৌঢ় ছিল, তার প্রমাণ তাঁর গদ্যরচনা। প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্যে অনুপ্রাস ব্যবহারের সার্থকতায় তিনি আজও অদ্বিতীয়। দৃষ্টান্ত দিই:

> তখন চৈত্রমাসের দিবসান্তে সূর্য অস্তোন্মুখ। দোতলার দক্ষিণ বারান্দায় চিত্রিত চিক্কণ চীনের টালি গাঁথা।—চোখের বালি।
>
> একদিন নববর্ষার বর্ষণমুখরিত মেঘাচ্ছন্ন সায়াহ্নে গায়ে একখানি সুবাসিত ফুরফুরে চাদর এবং গলায় একগাছি জুঁই ফুলের গোড়ে মালা পরিয়া মহেন্দ্র আনন্দমনে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল।—ঐ।
>
> বর্ষারাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারকে স্পন্দিত করিয়া মাঝে মাঝে মেঘ ডাকিয়া উঠিল।—গোরা।

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাসের বিশেষত্ব অনায়াস স্বচ্ছন্দতায় ও পরিমিতি রক্ষায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অন্তর্গূঢ় সঙ্গীতময়, ধ্বনিব্যবহারে সচেতন প্রয়াসের লক্ষণ নেই। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীতময়তায় বাক্যের অর্থরূপটি প্রসন্নমাধুর্যে আত্মপ্রকাশ করে। অতিপরিচিত শব্দপরম্পরায় নবপরিচয়ের বিস্ময় জাগে, অতি সাধারণ অর্থ হয়ে ওঠে অনন্যসাধারণ। যেমন:

> সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতিহাঁসগুলি দুলিতে দুলিতে কলরব করিতে করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির বামা ঝি কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত দক্ষিণ হস্তের উপর একরাশি পিতল কাঁসার থালা বাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে।—গুপ্তধন।
>
> যখন মনটা অত্যন্ত যাই-যাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খুব ধুম করিয়া একটা বিবাই হইল। সন্ধ্যাবেলায়

বাজনা বাজাইয়া বর আসিল। সেইদিন রাত্রে রসিক স্বপ্ন দেখিল,……।—পণরক্ষা।

সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনাপারে যেদিন বাজল সেদিন প্রথমটা আমার বুকের মধ্যে যেন বাণ বিঁধল।—স্ত্রীর পত্র।

বাবা ছিলেন কোনো নামজাদা ব্যাঙ্কের অধিনায়ক, তারই একজন অংশীদার হলেম আমি।—চোরাই ধন।

হাওয়ার বেগ বাড়তে চলল, বৃষ্টির বিরাম নেই। সুনেত্রাকে বললেম, "আলোটা লাগছে চোখে, নিবিয়ে দিই।" নিবিয়ে দিলেম।—ঐ।

আমি ছিলুম অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্র, সুনেত্রাকেও তার পিতা দিতেন শিক্ষা। পরস্পর মেলবার সুযোগ হয়েছিল বারবার।—ঐ।

আজ আমার সন্ধানে এক জায়গায় ম্যাঙ্গানিজের লক্ষণ যেন ধরা পড়েছিল। তাই দ্রুত উৎসাহে চলেছিলুম। কাকগুলো মাথার উপর দিয়ে গেরুয়া-রঙের আকাশে কা কা শব্দে চলেছিল বাসায়।—শেষ কথা।

বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগঙ্গনার গাঁঠ-ছেড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে।—ঐ।

এ কী খবর! আমাদের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গেছে। কাল রাত্রে সদর-খাজনার সাড়ে সাত হাজার টাকার এক কিস্তি সেখানে জমা হয়েছিল। আজ ভোরে নৌকা করে আমাদের সদরে রওনা হবার কথা।—ঘরে-বাইরে।

লাবণ্যের বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমি কলেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন করে মানুষ করেছেন যে, বহু পরীক্ষা-পাসের ঘসাঘসিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারে নি। এমন-কি এখনও তার পাঠানুরাগ রয়েছে প্রবল।—শেষের কবিতা।

কলকাতার কলেজে পড়ে যতিশংকর। থাকে কলুটোলা, প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে।—যোগাযোগ।

মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন।—ঐ।

এত কাল তো কাটল।—দুই বোন।

পরিশেষে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি, যেখানে অনুপ্রাসের সঙ্গীতময়তা গোপনচারী নয়, দূর-ব্যবচ্ছিন্ন বাক্যাবলীর কতিপয় পদে সাক্ষাতের আকস্মিকতায় বিস্ময়-মধুর নয়; যেখানে বাক্য-পরম্পরায় গ্রথিত বহুদূরব্যাপী ভাববিস্তারের অনুকূলে অজস্র অনুপম অনুপ্রাসের সমাবেশে সঙ্গীতময়তা ও অর্থময়তার হরগৌরী-মিলন এবং সম্ভবত যেখানে বাংলা গদ্যে অনুপ্রাস-প্রয়োগের তথা সঙ্গীতময়তার চরম সীমা।

> সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপরে উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন-অন্তরালে হেমশশী সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল সেই দূরত্বের বিচ্ছেদবশত সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্তী পরমরহস্যময় প্রমোদবনের মতো ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎ-যন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন—সুখ দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সংকটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত, সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মতো সহজ, সম্মুখবর্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষপিঞ্জরবর্তী স্পন্দিত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষত, তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবনসমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহারই হৃদয়-হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্মকোষের চতুর্দিকে রক্তপদ্মের কোমল পাপড়িগুলির মতো স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।—বিচারক।

প্রাচীন কালের আলংকারিক অর্থের অলংকারকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। বক্রোক্তি বলতে "বৈদগ্ধ্য-ভঙ্গী" উক্তি বা ভঙ্গি-বৈচিত্র্যকে বোঝালে স্বভাবোক্তি তার বিপরীত—"স্বভাবের

সরল প্রকাশ" ; বক্রোক্তি যদি অলংকৃত ভঙ্গি হয়, তাহলে স্বভাবোক্তি সেই ভঙ্গি যা অনলংকৃত। কিন্তু তা স্বভাবোক্তির আপাতরূপ, তার বাহ্য পরিচয় মাত্র। স্বভাবোক্তির সহজ ভঙ্গিও কবিকর্মকৌশল, এও এক ধরণের বৈদগ্ধ্য—সম্ভবত চরম বৈদগ্ধ্যের ফল। যে ভাষা সহজ, যে ভাষা সরল, যে ভঙ্গিতে বস্তু স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়, সেই ভাষা ও ভঙ্গিতে গড়া উক্তি স্বতঃই সুন্দর ও সজীব। এবং তাই তা অনলংকৃত। অন্যত্র কবি বা লেখক যতো বিদগ্ধ, যত ভঙ্গি-নিপুণই হোন না কেন, স্বভাবোক্তিতেই তাঁর বৈদগ্ধ্য ও নৈপুণ্যের চরম পরীক্ষা। স্বভাবোক্তির অনলংকৃত অলংকার আশ্চর্য মাধুর্যে মনোহরণ করে, কারণ, বস্তু স্বরূপে স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল ও বিস্ময়কর। একেই প্রাচীনেরা বলেছেন আদ্যালংকার, অর্থকে অলংকরণের যতো প্রকারভেদ আছে, এইটি তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে এই আদ্যালংকারের দৃষ্টান্ত দিই :

> তখন মাঘের শেষ। সরষে এবং তিসির ফুলে খেত ভরিয়া আছে। আখের গুড় জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গন্ধে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। ঘরে ঘরে গোলা-ভরা ধান এবং কলাই ; গোয়ালের প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। ওপাড়ে নদীর চরে বাগানে রাখালেরা গরু মহিষের দল লইয়া কুটির বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে—নদীর জল কমিয়া গিয়া লোকেরা কাপড় গুটাইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।—পণরক্ষা।
>
> রাত্রি নটার পর অঘোরমাস্টারের কাছে পড়া শেষ করিয়া বাড়ির ভিতরে শয়ন করিতে চলিয়াছি ; খড়খড়ে-দেওয়া লম্বা বারান্দাটাতে মিটমিটে লণ্ঠন জ্বলিতেছে, সেই বারান্দা পার হইয়া গোটাচারপাঁচ অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ নামিয়া একটি উঠান-ঘেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, বারান্দার পশ্চিমভাগে পূর্ব-আকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে, বারান্দার অপর অংশগুলি অন্ধকার, সেই একটুখানি জ্যোৎস্নায় বাড়ির দাসীরা পাশাপাশি পা মেলিয়া

> বসিয়া উরুর উপর সলিতা পাকাইতেছে এবং মৃদুস্বরে আপনাদের দেশের কথা বলাবলি করিতেছে।—জীবনস্মৃতি।
>
> গায়ে গাঁয়ে ঠেসাঠেসি ফিকে-সবুজ গাঢ়-সবুজ হলদে-সবুজ ব্রাউন-সবুজ রঙের গুল্মে বনস্পতিতে জড়িত নিবিড়তা, বাঁশ-পাতা-পচা পাঁকের স্তরে ভরে-ওঠা ডোবা, তারই পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি ; গোরুর গাড়ির চাকায় বিক্ষত। ওল, কচু ঘেঁটু, মনসা, মাঝে মাঝে আস্‌শেওড়ার বেড়া। ক্বচিৎ ফাঁকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আল দিয়ে বাঁধা কচি ধানের খেতে জল দাঁড়িয়েছে। গলি শেষ হয়েছে গঙ্গার ঘাটে। সেকালের ছোট ছোট ইঁট দিয়ে গাঁথা ভাঙা ফাটা ঘাট কাত হয়ে পড়েছে, তলায় চর পড়ে গঙ্গা গেছে সরে, কিছুদূরে তীরে ঘাট পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরনো ভাঙা বাড়ির অভিশপ্ত ছায়ায় দেড়শ বছর আগেকার মাতৃহত্যাপাতকীর ভূত আশ্রয় নিয়েছে বলে জনপ্রবাদ। অনেক কাল কোনো সজীব স্বত্বাধিকারী এই অশরীরীর বিরুদ্ধে আপন দাবি স্থাপনের চেষ্টামাত্র করে নি। দৃশ্যটা এইখানকার পরিত্যক্ত পুজোর দালান, তার সামনে শেওলা-পড়া রাবিশে এবড়োখেবড়ো প্রশস্ত আঙিনা। কিছুদূরে নদীর ধারে ভেঙে-পড়া দেউল, ভাঙা রাসমঞ্চ, প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, ডাঙায় তোলা পাঁজর বের-করা ভাঙা নৌকো ঝুরি-নামা বটগাছের অন্ধকার তলায়।—চার অধ্যায়।

স্বভাবোক্তিতে বস্তুই লক্ষ্য, লেখকের মনটি অবলম্বন মাত্র ; বস্তুর বস্তু-ত্বই এর প্রাণ, এর সৌন্দর্য। এ হচ্ছে অর্থে আঁকা খাঁটি চিত্র, চোখ দিয়ে দেখতে হয় ; যে-কোনো কিছুর, যে-কোনো চেষ্টার রঙে-রেখায় আয়তনে সাক্ষাৎ দর্শন। এই চিত্ররূপেও বস্তু 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী', দক্ষ রূপকারের হাতে এই চিত্ররূপ বস্তুর রসরূপ হয়ে ওঠে। আগের দৃষ্টান্তগুলিতে বস্তুর রূপে ভাবের অনুরঞ্জন অবশ্যই আছে, এবার শুদ্ধ বস্তুরসের সুন্দরতম দৃষ্টান্ত দিই।

> সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল।

প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপঝুপ করিয়া দ্রুতবেগে ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘনঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত; কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনো মতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো-বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই—ধীরে সুস্থে স্নান সারিয়া, জপ করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু-বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুলগতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।—জীবনস্মৃতি।

বক্রোক্তিভেদের শ্রেষ্ঠ অলংকার উপমা, যার মূল সাদৃশ্যে বা অনুরূপতায়। যে অনুরূপতাদর্শন নিখিল-কবিপ্রতিভার রহস্যের মৌল ভিত্তি, তাকে আশ্রয় করে যে-বক্রোক্তির সৃষ্টি, তা যে অলংকার এবং শ্রেষ্ঠ অলংকার হয়ে উঠবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। ভাবের সঙ্গে বস্তুর, বস্তুর সঙ্গে ভাবের, একের সঙ্গে অন্যের সাদৃশ্য বা অনুরূপতা আবিষ্কার নিছক দৃষ্টি বা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার নয়, তা আত্মসমাহিত চিত্তের স্বতোৎসারিত চিত্রময় প্রকাশ। এইজন্য যে-কোনো কবিত্বের তারতম্য বিচারের প্রায় কষ্টিপাথর হচ্ছে কবির ব্যবহৃত উপমাগোত্রের অলংকার।

রবীন্দ্রনাথের উপমাগোত্রের অলংকারগুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে পূর্বাপর প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় এগুলি তাঁর স্টাইলের

কতখানি অঙ্গীভূত। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যঞ্জনাগর্ভ। প্রায় প্রথম দিকের একটি সচেতন রচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিই। নিছক অলংকারের দৃষ্টান্ত নয় বলেই পূর্বাপর প্রসঙ্গ সমেত উদ্ধৃতির প্রয়োজন:

> রঘুপতি বনের মধ্যে পা দিয়াই কুড়ি হাজার সৈনিকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন শুনিতে পাইলেন। বনের সহস্র গাছ শাখা বিস্তার করিয়া পাহারা দিতেছে। কালপেচক তাহার সদ্যোজাত শাবকের উপরে যেমন পক্ষ বিস্তারিত করিয়া বসিয়া থাকে, তেমনি অরণ্যের বাহিরকার বিরাট রাত্রি অরণ্যের ভিতরকার গাঢ়তর রাত্রির উপর চাপিয়া ডানা ঝাঁপিয়া নীরবে বসিয়া আছে—অরণ্যের ভিতরে এক রাত্রি মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া আছে, অরণ্যের বাহিরে এক রাত্রি মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে। রঘুপতি সে রাত্রে বন-প্রান্তে শুইয়া রহিলেন।—রাজর্ষি।

"অরণ্যের বাহিরকার বিরাট রাত্রি" এবং "অরণ্যের ভিতরকার গাঢ়তর রাত্রির" সঙ্গে "কালপেচক" ও "তাহার সদ্যোজাত শাবকের" উপমাটি কেবলমাত্র সাদৃশ্যকে উদ্ঘাটিত করেই শেষ হয়ে যায় নি, বাচ্য অর্থের অতীত এক গভীর অর্থকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছে, যে অর্থটিই এখানে পরম রমণীয়। মুখ্য উপমাটির অনুষঙ্গী অতিশয়োক্তি ও সমাসোক্তি সেই অর্থকে আরও বিলসিত করেছে। উপমা দিয়েই বলতে হয়, এখানকার উপমাটি যেন নানা রঙের মুক্তাখচিত রাজমুকুটের ঠিক মাঝখানের হীরের টুকরোটির মতো। স্টাইল থেকে একে কে বিচ্ছিন্ন করবে? উপমায় শোভমান স্টাইলের এই রাজবেশের পাশে শুচি সুন্দর নির্মল বেশের দৃষ্টান্ত দিই:

> জ্যোৎস্না তখন জলে স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তীরে গ্রাম নাই, ধানের খেতের ঘন-কোমল সুবিস্তীর্ণ সবুজ জনশূন্যতার উপরে নিঃশব্দ শুভ্ররাত্রি বিরহিনীর মতো জাগিয়া রহিয়াছে।—নৌকাডুবি।
>
> পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মতো ঊর্ধ্বমুখে শয়ান রহিয়াছে।—ঐ।
>
> চন্দ্র কখন এক সময় ছাদগুলার নীচে নামিয়া গেল। পূর্বদিকে

তখন নিদ্রিত মুখের হাসির মতো একটুখানি আলোকের আভাস দিয়াছে।—গোরা।

অথবা, এই গোত্রের উপমার চরমতম রূপ যেখানে ধরা দিয়েছে তার একটি-দুটি :

আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।—জীবনস্মৃতি।

সুচরিতা ললিতার একটি মনের কথা জানিয়াছে—সেই মনের কথাটিই আজ ললিতার কালো চোখের পল্লবের ছায়ায় করুণায় ভরিয়া উঠিয়া একখানি সজল স্নিগ্ধ মেঘের মতো বিনয়ের চোখে দেখা দিল।—গোরা।

ফরাসী সমালোচকেরা যাকে বলেন স্টাইলের রং বা বর্ণলেপ (যার কথা পরে বলছি), যার মূলে থাকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণক্ষমতা এবং কল্পনাশক্তি, যা একাধিক সম্পূর্ণ চিত্রকল্প ও চিত্রকে একীভূত করে একটি অখণ্ড চিত্র নির্মাণ করে, এবং যাকেই তাঁরা রচনার প্রাণ বলে আখ্যাত করে থাকেন, সেই রং বা বর্ণলেপের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষাগুলি। এগুলি অলংকার নয়, রস বা ভাবের আক্ষেপে স্বতোৎসারিত বাণীর অব্যর্থ রূপ। একটি রূপকের দৃষ্টান্ত দিই :

বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের জীবনের ছিপি-আঁটা মসীপাত্র উল্টাইয়া ভাঙিয়া ফেলিল—বিনোদিনীর কালো চোখ এবং কালো চুলের কালি দেখিতে দেখিত বিস্তৃত হইয়া পূর্বেকার সমস্ত সাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একেবারে একাকার করিয়া দিল।—চোখের বালি।

এই ধরনের অজস্র দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে। যেমন :

এইরকম রাতে আমাদের মনের জানলা-দরজার ছিটকিনিগুলা নড়িয়া যায়। ভিতরে ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলাকে উলটপালট করিয়া দেয়, পর্দাগুলা ফর্‌ফর্ করিয়া কে কোন্

দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না।—চতুরঙ্গ।

উৎপ্রেক্ষার দৃষ্টান্ত, যেমন :

ধ্যানমগ্ন রমেশ ও সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না-উত্তরীয়ের দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাত্রি ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে।—নৌকাডুবি।

রবীন্দ্রনাথের উপমাগোত্রের অলংকারপ্রয়োগের যে বৈশিষ্ট্যটি অতি-সহজেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে, প্রায়ক্ষেত্রেই একই গোত্রের অলংকারের মিশ্রণ, আলংকারিক পরিভাষায় যার নাম সংকর এবং সংসৃষ্টি। উপমা, উৎপ্রেক্ষা বা রূপকে সুরু হয়ে অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তিতে শেষ, অথবা তার বিপরীত। দুই বস্তুর সারূপ্য আবিষ্কারে উদ্‌বেজিত কল্পনা যেন আরোপ, সংশয়, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি—বিচিত্র উপায়ে চরম রূপটির পরিচয় লাভের জন্য অস্থির। তার ফলে, আঁকা যে-কোনো চিত্রের রেখাগুলির বলিষ্ঠতা বজায় থেকেও "স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে" বর্ণলেপে সমগ্রটি হয়ে ওঠে অতিশয় জমকালো। এই জমকালো চিত্র যে কতখানি উজ্জ্বল, কতখানি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে তার একটি নমুনা :

অন্ধকার অরণ্য ও শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল। জলস্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল ; এবং অকস্মাৎ একটি বিদ্যুৎদন্ত-বিকশিত ঝড় শৃঙ্খলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল।—ক্ষুধিত পাষাণ।

এখানে শব্দালংকারের দিকেও নজর রাখতে হবে। স্টাইলের অন্তর্ভূত উপাদান হিসাবে এই ধরনের রেখায় বলিষ্ঠ ও বর্ণে উজ্জ্বল চিত্র রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় অতি সহজলভ্য। পরিচিত উপমা, পরিচিত রূপক ও সমাসোক্তিতে গড়া একটি অতি বিস্ময়কর অসাধারণ জমকালো চিত্র উদ্ধৃত করি :

দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম-দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত শজনেগাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সেই

সূর্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল, একটা প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো—তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে-থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা যেন হু হু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্য।—ঘরে-বাইরে।

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের চিত্র-রীতির প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ভাষা-রীতির প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। চিত্র-রীতি ভাবপ্রকাশের রীতি বলেই ভাষা-রীতির সঙ্গে তার সম্পর্কটি নিগূঢ় হতে বাধ্য। চিত্রের বলিষ্ঠ রেখার মতোই রবীন্দ্রনাথের ভাষার কাঠামো—এখানে বাক্যগঠন, বাক্যের অন্বয়, শব্দসংস্থান ইত্যাদি—অত্যন্ত ঋজু স্পষ্ট ও যথাযথ। যে শব্দগুলি তিনি নির্বাচন করেন সেগুলি সহজ সরল অতিপরিচিত শব্দই, কিন্তু সজ্জাগুণে পরিচিত সহজ শব্দার্থেই নবপরিচয়ের বিস্ময় সৃষ্টি হয়। চিত্রে যেমন বর্ণের প্রাচুর্য, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তেমনি অকৃপণতার ঔদার্য। স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ সরল ও যৌগিক বাক্যই মুখ্যত তাঁর গদ্যের ভিত্তি; সুবিন্যস্ত গতি ও সুসম তালে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্য-পরম্পরায় যে অনুচ্ছেদ বা গদ্য-স্তবকগুলি গড়ে ওঠে, নিছক ভাষা-রীতির দিক থেকে তা তাঁর চিত্র-রীতিরই প্রতিরূপ।

স্টাইল

স্টাইলের সংজ্ঞা যাই হোক, তা যে ভাষা বা ভাষা-রীতির অতিরিক্ত কিছু, এ তো জানা কথা। তাই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির সামগ্রিক আলোচনার পরও তাঁর গদ্যের স্টাইল সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ থাকে। কোনো কবির চেয়ে কোনো গদ্য-লেখকের স্টাইলের স্বরূপ বিচার করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। কারণ, কাব্যের ক্ষেত্রে চিন্তা বা ভাবের গুণগত প্রকৃতি মূলত একটিই—যার উপাদান হৃদয়াবেগ ও অনুভূতি; কিন্তু গদ্যরচনার ক্ষেত্রে তার প্রকৃতি বিচিত্র—হৃদয়াবেগ ও অনুভূতি ছাড়াও তার উপাদান যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি অনেক কিছু। এবং গদ্যের ভাব-প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের জন্যই গদ্যলেখকের স্টাইলও বিচিত্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মতো গদ্যলেখকের স্টাইলের স্বরূপ বিচার এই কারণেই আরও কঠিন। এছাড়া, স্টাইলের আলোচনার দুটি দিক আছে—একটি বিচারের, অন্যটি অনুভবের। বিচারের দিক—শব্দ-অর্থ, শব্দযোজনা, বাক্যরচনা, অলংকার, ভাব বা চিন্তার পারম্পর্য ইত্যাদি; আর অনুভবের দিক হচ্ছে, এদের সবকিছুর অব্যবচ্ছিন্ন সামগ্রিকতা বা যোগফলটি। বিচারের দিকটি অবশ্যই অপরিহার্য, তবু বিশেষ করে যোগফলের দিকে নজর রেখেই রবীন্দ্রনাথের গদ্য-স্টাইলের কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করি।

স্টাইলের চরম সংজ্ঞা নির্ণয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করে লাভ নেই। প্রাথমিক দৃষ্টিতে স্টাইল হচ্ছে সজ্জিত ভাষা, কিন্তু তা অকৃত্রিম, কারণ, তা ভাষার প্রকৃতি থেকেই উদ্ভূত হয়। চিন্তা বা ভাবের প্রকাশের অভিমুখী একটা সু-প্রচেষ্টা না হয়ে মানুষের ভাষা যদি ভাবের যথাযথ প্রকাশ হতো, তাহলে ভালো করে বলার আর্ট বলে কিছু থাকতো না, তাহলে ভাষা হতো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ভাষাবস্তুটিই অসম্পূর্ণ। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতার কল্যাণেই বিচিত্র রেখাবলীর মধ্য থেকে,

মনের গোপনতম কন্দর থেকে চিন্তা বা ভাবকে ভাল করে ধরার প্রচেষ্টা হয়,...আর, তা লেখকের কর্ম হয়ে ওঠে।*

অসম্পূর্ণ ভাষা এমন এক নমনীয় উপাদান, যাকে দুমড়ে-মুচড়ে অন্তহীন মূর্তি দান করা যায়। আর, একমাত্র এই কারণেই স্টাইল-ব্যাপারটা সম্ভব হয়। স্টাইল শিক্ষণীয় কোনো কৃত্রিমতা নয়, স্বভাবজাত আর্ট। তা ভাবের উদ্ঘাটিত রূপের সমুচিত বিন্যাসকরণ, ভাবের নিখুঁত প্রকাশের এক আন্তর ও নিজস্ব প্রচেষ্টা। ভাবকে স্থায়িত্ব দেয় স্টাইল। ক্রুন্তিয়ের মন্তব্য: ভাব বেঁচে থাকে প্রকাশিত রূপের মধ্যেই। স্টাইলের দামেই ভাবের যা-কিছু দাম। স্টাইল হচ্ছে অন্তরমানসের প্রস্ফুটন।

প্রতিটি লেখকের স্টাইল স্বতন্ত্র, কারণ, স্টাইল লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। লেখকের ব্যক্তিত্বের মৌলিকত্বের মতো তাঁর স্টাইলও মৌলিক হতে বাধ্য। কারণ, "স্টাইল হচ্ছে মানুষটি"। কিন্তু কোন মানুষটি? ব্যুফোঁর সংজ্ঞাটিকে একসময় প্রায় আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন স্যাঁৎ-ব্যভ। কিন্তু জীবন-যাপন করে যে-মানুষটি, আর লেখক মানুষটি তো এক হতে পারে না। বাস্তব-জীবন, নৈতিক-জীবন সব সময়েই শিল্পী-জীবনে প্রভাব ফেলে থাকে, কিন্তু সেই প্রভাবের ঊর্ধ্বে যে ভাব-জীবন—সেই জীবনের অধিকারী-মানুষটিই স্টাইল। স্টাইল মানুষটি, তা সত্যি, কিন্তু মানুষ-লেখকটি নয়, লেখক-মানুষটি।

"স্টাইল ভাষার সজ্জীকরণ"; "ভাবের শিল্পময় প্রকাশ"; "অন্তরমানসের প্রস্ফুটন"; "মানুষটি এবং তাঁর ভাবজীবনটি";—এদের সবকটিই স্টাইলের সংজ্ঞা হতে পারে। এবং রচনা-পরিকল্পনার একেবারে গোড়ায় এদের প্রয়োগ করলে দেখতে পারবো, সবই ঘুরে ফিরে এসে দাঁড়ায় শব্দার্থের নিজস্ব বিন্যাস এবং শব্দার্থের ঐক্যবিধানের জন্য বক্রতার উপরে। নিজের হৃদয়কে যিনি সত্য করে প্রকাশ করতে চান, তাঁকে ছাঁচে-ঢালা শব্দ বা ছক-বাঁধা বাক্য ব্যবহার করলে চলে না; শব্দগুলিকে নতুন করে "আবিষ্কার" করতে হয়, চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে নিজস্ব ভঙ্গি দিতে হয়। এমন লেখককে কেয়ারি থেকে কেটে-তোলা পাথরের মতো শব্দভাণ্ডার থেকে

* মন্তব্যটি ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিদ দারমেসতরের ('লা ভা দে ম' গ্রন্থে)।

শব্দ তুলে আনতে হয়; পাথরের মতোই শব্দগুলির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধের কমতি হতে পারে না, ওজনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে না, শব্দগুলিকে সরানো চলে না এবং পাথরের মতোই তাদের আঘাত সহনক্ষম হতে হয়।* এরই সঙ্গে শব্দের নমনীয়তার সূক্ষ্মতাকে যথাযথ ভাবে ধরতে পারাটাই স্টাইলের উপলব্ধি। এটি স্বভাবজাত হতে পারে, অনুশীলনজাতও হতে পারে। এইভাবে শব্দবিন্যাসের ফলে যেন এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শব্দগুলি নিজস্ব বর্ণ, ধ্বনি, স্বভাব বিসর্জন দিয়ে একটা সামগ্রিক পরিবর্তিত রূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে ব্যবহৃত আগের অসংখ্য উদ্ধৃতিতে এর অকাট্য প্রমাণ মিলবে। তবু দু-একটি উদ্ধৃতি দিই:

> সূর্যাস্তকালের দিগন্তবিলীন পাণ্ডুবর্ণ সন্ধ্যাতারা ঘনায়মান সায়াহ্নে ক্রমেই যেমন পরিস্ফুট দীপ্তি লাভ করে, কিরণও তেমনি কিছুদিন ধরিয়া ভিতর হইতে আনন্দে লাবণ্যে নারীত্বের পূর্ণতায় যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সে যেন তাহার গৃহের, তাহার সংসারের ঠিক মধ্য-আকাশে অধিরোহেণ করিয়া চারিদিকে আনন্দের মঙ্গলজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; সেই জ্যোতিতে তাহার বৃদ্ধ পিতার শুভ্রকেশের উপর পবিত্রতার উজ্জ্বল আভা পড়িল, এবং সেই জ্যোতি আমার উদ্‌বেল হৃদয়সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গের উপর কিরণের মধুর নামের একটি করিয়া জ্যোতির্ময় স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিল।—অধ্যাপক।
>
> আজ কেবলই মনে হচ্ছে এই-যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারই দিগদিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।' কিন্তু, তবু এই বেদনা, এই রোদন, এই বিরহ একেবারে শূন্য নয়—এই অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত

* উপমাটি গুস্তাভ লাসঁর ('কঁসেই স্যুর ল্যার দেক্রির্' গ্রন্থে)

গোপনে ভরা রয়েছে ; একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুলছে তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে ।—শ্রাবণসন্ধ্যা ।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে। পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না ; মনটা এমন এক রকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে ।—শেষের কবিতা ।

সেকালের আলংকারিকদের মতো সরল (simple), পরিমিত (tempéré) বা মহৎ (sublime) স্টাইলভেদ মানার কোনো হেতু নেই, যেমন হেতু নেই কাব্যের ও গদ্যের স্টাইলের ভেদ মানার। কাব্যের ও গদ্যের স্টাইলের যে ভেদ, তা প্রকাশের তীব্রতার মাত্রাভেদ মাত্র ; কাব্যে তা বেশি জীবন্ত, বেশি বর্ণাঢ্য, গদ্যে তা পরিমিত ও সংযত। মূলত, স্টাইল একটিই, তা হচ্ছে স্বাভাবিক স্টাইল। অন্যভাবে বলতে গেলে, স্টাইল প্রকাশিত ভাব বা চিন্তার এবং লেখকের ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে। স্টাইল যদি স্বাভাবিক হয়, তাহলে তা হবে অকপট ; যদি অকপট হয়, তাহলে তা হবে নিজস্ব ; যদি নিজস্ব হয়, তাহলেই হবে মৌলিক। মৌলিকতা বলতে গোতিয়ের মন্তব্য : সর্বজনীনতায় ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ছাপ। এই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ছাপ ভাব বা চিন্তায় থাকে না, থাকে স্টাইলে। এটি যে কতবড় সত্য, তা রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা থেকে প্রমাণিত হবে। রবীন্দ্রনাথ যা-ই লিখুন—গল্প উপন্যাস, ধর্ম-দর্শন-সাহিত্যতত্ত্ব-শব্দতত্ত্ব যে কোনো বিষয়ে—সবকিছুর মধ্যেই তাঁর এই মৌলিকতার বা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট, দেখামাত্রই যাকে চিনতে পারি রবীন্দ্রনাথের স্টাইল বলে।

স্টাইলের চারটি গুণ—স্বচ্ছতা (clarté), রং বা বর্ণলেপ (couleur),

গতি (mouvement) এবং ধ্বনির সঙ্গতি (harmonie)। স্বচ্ছতা বলতে, ভাব বা চিন্তাটি অনায়াসে স্পষ্ট হয়ে ওঠা। এটি নির্ভর করে মূলত ভাব বা চিন্তার দলগুলিকে নিপুণ ও যথাযথ ভাবে একের পর এক মেলে ধরার উপরে। স্টাইলের এই গুণটির দিকে তাকিয়েই ব্যুফোঁ মন্তব্য করেছিলেন : ভালো লিখতে হলে একই সঙ্গে ভালো করে চিন্তা করতে হবে, ভালো করে অনুভব করতে হবে, ভালো করে প্রকাশ করতে হবে। স্টাইলের এই স্বচ্ছতা আনে পরিচিত শব্দ ও বাক্-ভঙ্গি। এক্ষেত্রে শব্দের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে-শব্দ ভাববস্তুকে যথাযথ প্রকাশ করতে সক্ষম সেই শব্দটিই "একমাত্র" শব্দ ; ইতর সাধু বলে—এমন কি দেশী বিদেশী বলেও—শব্দের কোনো গোত্রভেদ নেই। শব্দের যথাযথতাই বড় কথা। কিন্তু সমুচিত শব্দ না হলে শব্দ যথাযথ হয় না। শব্দের সমুচিতত্বই স্বচ্ছতা সৃষ্টির মূলে ; তার ফলে আসে সংক্ষিপ্তি, অতিশয়তা বর্জন। যথাযথত্ব ও সংক্ষিপ্তি থেকে আসে পরিচ্ছন্নতা এবং তা থেকে সহজতা ও সারল্য।

এই স্বচ্ছতাগুণটি যে রবীন্দ্রনাথের স্টাইলের প্রধানতম গুণ তা স্বতঃ-প্রমাণিত। চিন্তা বা ভাবনার স্বচ্ছতার জন্য তাঁর স্টাইলের স্বচ্ছতা যে-কোনো প্রবন্ধ যে-কোনো রচনা থেকেই অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দাবলী এতো পরিচিত যে, মোটামুটি শিক্ষিত বাঙালী অভিধানের সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রায় শতকরা পঁচানব্বইটি শব্দের অভিধাগত অর্থ বুঝতে সক্ষম, বাক্-ভঙ্গিতেও কখনো অপরিচয়ের বাধা ঘটে না ; শব্দাবলী সমুচিত ও যথাযথ। যাঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথ বাক্‌বহুল, সম্ভবত তাঁরা ভ্রান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বাক্‌সংক্ষিপ্তি রবীন্দ্রনাথের কাছে আশা করা ভুল। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা বা ভাব (এখানে প্রবন্ধে) মুখ্যত যুক্তিপ্রধান। যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হলেই যেখানে চিন্তাটি স্পষ্ট হয় সেখানে বাক্‌সংক্ষিপ্তি যেমন ধরনের হয়, চিন্তা যেখানে ভাবপ্রধান সেখানে বাক্‌সংক্ষিপ্তির ধরনটি তেমন হতে পারে না। ভাবনাপ্রধান চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত হলে চলে না, তাকে প্রকাশিত হতে হয়। এই জন্যই ভাবনাপ্রকাশের ক্ষেত্রে বাক্‌সংক্ষিপ্তির প্রকৃতিই পৃথক। একটি দৃষ্টান্ত দিই :

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায় কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে—পাঠান-মোগল পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনিই করিয়াছে তাহারাই আছে।

তখনকার দুর্দিনেও এই কাটাকাটি-খুনাখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জনসত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না—সেদিনও সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর সমস্তই গ্রাস করে; কারণ, সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেই জন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জনমুখর বাত্যাবর্ত শুষ্কপত্রের ধ্বজা তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।—ভারতবর্ষের ইতিহাস।

উদ্ধৃত তিনটি অনুচ্ছেদের বক্তব্যটির মূলে আছে কঠোর যুক্তি ও প্রমাণ। কিন্তু চিন্তাটি নিছক যুক্তিপ্রধান যদি হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে তা অনেক কম বাক্যে অবিস্তারিত ভাবেই প্রকাশ করা চলতো; সেখানে স্বচ্ছতার জন্য

বাক্য ও শব্দ উভয়ের সংক্ষিপ্তি অপরিহার্য রূপেই দেখা দিত ভাল স্টাইলিস্টের হাতে, যেমনটি দেখা দিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরনের রচনায়। কিন্তু ভাবনাপ্রধান চিন্তায় এখানে যুক্তিপ্রতিষ্ঠার ধরনটাই আলাদা। এখানে যাকে বাক্-বিস্তার বলে ভুল হয়, আসলে তাই হচ্ছে সমুচিত শব্দব্যবহারে ভাবনার অনতিশয়িত রূপ। এখানে শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে সংক্ষিপ্তি বা পরিমিতি আছে কি না তার বিচার শব্দ ও বাক্যের সংখ্যাগুনতির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তাদের প্রয়োজনের উপরে।

স্টাইলের স্বচ্ছতার সর্বশেষ উপাদান হল প্রযুক্ত শব্দাবলীর ঐশ্বর্য এবং সেই ঐশ্বর্যের ব্যবহারের মাত্রা। ভালো স্টাইলিস্ট শব্দ থেকে কামধেনুর মতো অর্থ দোহন করেন এবং তা শব্দের অতিপরিচিত অর্থকে ছাড়িয়ে অপরিচিতের ব্যঞ্জনা আনে। এটি না হলে, শব্দ ভাবের নিছক ফটোগ্রাফি হলে, স্টাইল হয় বিবর্ণ, বৈচিত্র্যহীন। সেই স্টাইলই ঐশ্বর্যবান, যেখানে শব্দার্থের আবরণ ভেদ করে নব নব অর্থ, চিত্রকল্প ও ভাব ভীড় করে আসে, পাঠকের মনটিকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে। কিন্তু এই ঐশ্বর্য প্রকাশেরও মাত্রা আছে। ঐশ্বর্যের দীপ্তিতে মনের চোখকে বেশিক্ষণ ধাঁধানোর চেষ্টা ভাল স্টাইলিস্টের লক্ষণ কখনোই নয়। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে একটানা চেয়ে থাকাটা মনের পক্ষে ক্লান্তিকর। পাহাড়ের চুড়োয় উঠে সে উপত্যকায় নামতে চায়, চায় গভীর অর্থবহ শব্দের সঙ্গে সহজ অর্থের মেলবন্ধন। বর্ণহীন শব্দগুলি এক্ষেত্রে বর্ণোজ্জ্বল শব্দের রিলিফের কাজ করে, ঠিক ছবিতে যেমন ছায়া আলোকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। সবকিছুই উজ্জ্বল হলে চলে না, তাহলে তা সত্যি সত্যি স্বচ্ছ হতে পারে না। বর্ণনাত্মক ও ব্যঞ্জনাত্মক উভয়বিধ মিশ্রণেই স্বচ্ছ স্টাইলের সার্থকতা। এরই নাম "উজ্জ্বল স্বচ্ছতা" (clarté lumineuse)। স্টাইলের এই উজ্জ্বল স্বচ্ছতার দৃষ্টান্ত দিই:

> সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া আবার সে ধুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকোচুরি খেলায় যেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইখানেই অন্তর্হিত হইল।—সম্পত্তি সমর্পণ।

ভোরে ক্যাবিনে যখন বিছানায় ঘুম ভাঙিয়া গেল গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলাম, সমুদ্রে আজ ঢেউ দিয়াছে; পশ্চিম দিক হইতে বেগে বাতাস বহিতেছে। কান পাতিয়া তরঙ্গের কলশব্দ শুনিতে শুনিতে এক সময় মনে হইল, কোন্ একটা অদৃশ্যযন্ত্রে গান বাজিয়া উঠিতেছে। সে গানের শব্দ যে মেঘগর্জনের মতো প্রবল তাহা নহে, তাহা গভীর এবং বিলম্বিত; কিন্তু যেমন মৃদঙ্গ-করতালের বলবান শব্দের ঘটার মধ্যে বেহালার একটি তারের একটানা তান সকলকে ছাপাইয়া বুকের ভিতর বাজিতে থাকে, তেমনি সেই ধীর গম্ভীর সুরের অবিরাম ধারা সমস্ত আকাশের মর্মস্থল পূর্ণ করিয়া উচ্ছুলিত হইতেছিল। শেষকালে এমন হইল, আমার মনের মধ্যে যে-সুর শুনিতেছিলাম তাহাই কণ্ঠে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এরূপ চেষ্টা একটা দৌরাত্ম; ইহাতে সেই বড়ো সুরটির শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়; তাই চুপ করিলাম।—অন্তত ও বাহির।

রাত-কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিখুঁত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে ফুঠে উঠল, রেবতী মুগ্ধ চোখে না দেখে থাকতে পারল না। নীলা চলে গেল। রেবতী টেবিলের উপর মুখ রেখে পড়ে রইল। এমন আশ্চর্য সৌন্দর্য সে কল্পনা করতে পারে না। একটা কোন বৈদ্যুত বর্ষণ প্রবেশ করেছে ওর শিরার মধ্যে, চকিত হয়ে বেড়াচ্ছে অগ্নিধারায়। হাতের মুঠো শক্ত করে রেবতী কেবলই নিজেকে বলতে লাগল, কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না। খুব শক্ত শপথ নেবার চেষ্টা করতে চায়, মুখ দিয়ে বেরোয় না। ব্লটিঙের উপর লিখল, যাব না, যাব না, যাব না। হঠাৎ দেখলে তার টেবিলে একটা ঘন লাল রঙের রুমাল পড়ে আছে, কোণে নাম সেলাই করা 'নীলা'। মুখের উপর চেপে ধরল রুমাল, গন্ধে মগজ উঠল ভরে, একটা নেশা সির্ সির্ করে ছড়িয়ে গেল সর্বাঙ্গে।—ল্যাবরেটরি।

দিদেরো বলেছিলেন: নক্শা (dessin) সত্তার আকার দেয়, রং দেয়

তার প্রাণ। সাহিত্যে ভাব হচ্ছে নক্শা, চিত্রকল্প রং। নিছক ভাবনা-প্রধান লেখককে নক্শাকারের (dessinateur) সঙ্গে তুলনা করলে চিত্রকল্পপ্রধান লেখককে তুলনা করতে হয় বর্ণনিপুণ শিল্পীর সঙ্গে। ছবিতে রঙের যে কাজ, সাহিত্যে চিত্রকল্পের সেই কাজ। চিত্রকল্পই রচনায় প্রাণের ঝলক (l'éclat de la vie) এনে দেয়। সাহিত্যরচনায় রং অবশ্য শুধু রংই নয়—রেখা, আকার, গতি, ধ্বনি, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ সবকিছু। ছবিতে রং বলতে যা বোঝায়, স্টাইলের রঙের অর্থ তার চেয়ে অনেক ব্যাপক। রঙীন স্টাইল (style coloré) আর চিত্রকল্পপ্রধান স্টাইল (style imagé) একই জিনিষ, আবার এরই নাম প্রাণচঞ্চল স্টাইল (style animé)। আর, এইজন্যই রঙীন স্টাইলের ক্ষেত্রে কেবল চিত্রকল্পই শেষ কথা নয়, তার পরেও আসে গতির কথা। স্টাইলের এই রং বা চিত্রকল্প সৃষ্টি করে শব্দ, কখনো একক ভাবে, কখনো মিলিত ভাবে, কখনো বাক্যাংশে, কখনো সম্পূর্ণ বাক্যে। আগেই বলেছি, স্টাইলের এই গুণটি আসে লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণক্ষমতা এবং কল্পনাশক্তি থেকে। এদের দুটি একসঙ্গে নাও থাকতে পারে, যেখানে থাকে সেখানে স্টাইল "রঙে রঙে রঙীন" হয়ে ওঠে, যেমন হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের স্টাইল।

প্রধানত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণক্ষমতার ফলে সৃষ্ট রঙীন স্টাইলের উদাহরণ দিই:

> সূর্য অস্ত গেল। আকাশ ও জলের উপর চমৎকার রঙ দেখা দিয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি রেখামাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি যৌবনপরিপূর্ণ পরিস্ফুট দেহের মতো নিটোল এবং সুডোল। এই অপার অখণ্ড পরিপূর্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক-প্রান্ত পর্যন্ত থম্ থম্ করছে।—য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি।
>
> তীরের বনরাজি অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যাবধূর সোনার অঞ্চলে কালো পাড় টানিয়া দিল। গ্রামান্তরের বিলের মধ্যে সমস্ত দিন চরিয়া বন্যহংসের দল আকাশের ম্লানায়মান সূর্যাস্তদীপ্তির মধ্য দিয়া ওপারের তরুশূন্য জলাশয়গুলিতে রাত্রিযাপনের

জন্য চলিয়াছে। কাকেদের বাসায় আসিবার কলরব থামিয়া গেছে। নদীতে তখন নৌকা ছিল না; একটিমাত্র বড়ো ডিঙি গাঢ় সোনালি-সবুজ নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়া নিঃশব্দে গুণ টানিয়া চলিয়াছিল।—নৌকাডুবি।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। চিত্রকল্পগুলি মিলিত রূপে যখন পরিপূর্ণ অখণ্ড চিত্র হয়ে ওঠে তখন তা পারিভাষিক অলংকারের গণ্ডিতে পড়ে, তখন তা চিত্ররীতির আলোচনার বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথের রঙীন স্টাইলের সেই চিত্ররীতির পরিচয় আগে দিয়েছি। এবারে প্রধানত কল্পনাশক্তির ফলে সৃষ্ট রঙীন স্টাইলের দৃষ্টান্ত দিই :

> মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!
>
> —লাইব্রেরি।

রবীন্দ্রনাথের স্টাইল পর্যবেক্ষণ ও কল্পনা উভয়বিধ শক্তির গুণে আশ্চর্য রঙীন। শব্দ, উপমা, ব্যঞ্জনা—রং ফোটানোর সমস্ত উপায়গুলিকে তিনি যেন অনায়াসে আয়ত্ত করতে পেরেছেন।

স্টাইলের রঙের সঙ্গেই গতির কথা। স্যাঁৎ-ব্যভ বলেছেন : ভাবের রং আর গতিই যদি না হয়, তাহলে স্টাইল আর কাকে বলে? অনেক আগেই ব্যুফোঁ বলেছিলেন : শৃঙ্খলা ও গতি থাকাটাই হচ্ছে স্টাইল। শৃঙ্খলা নির্ভর করে ভাবকে জীবন্ত করে সম্প্রসারিত করার উপরে। শৃঙ্খলা আসে ভাবের পরিকল্পনা থেকে, গতি আসে ভাবের তীব্রতার মাত্রা এবং বাক্যরচনা থেকে।

ভাবের তীব্রতা সৃষ্টি করে স্টাইলের আভ্যন্তর গতি—যা স্টাইলের প্রাণের একটা অংশ (অন্য অংশ রং); এরই নাম স্টাইলের প্রাণবন্ততা (l'élan du style)। অন্যদিকে বাক্যরচনা থেকে সৃষ্টি হয় বাহ্য গতি, যার নাম দেওয়া চলে স্টাইলের গতিভঙ্গি বা চাল (l'allure du style)। কিন্তু কার্যত আভ্যন্তর গতিই বাহ্য গতির নিয়ামক এবং উভয়ে মিলে অখণ্ড গতি হয়ে ওঠে; প্রাণবন্ততাই গতিভঙ্গিকে অনুপ্রাণিত করে।

স্টাইলের গতি ধরা দেয় ভাবের শক্তির পারম্পর্য ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে। যে-ভাব জীবন্ত, যে-ভাব ভিতর থেকে উৎসারিত হয়ে ওঠে, তার একটি নিজস্ব চালনাশক্তি আছে; সে শক্তিটি নিয়মিত হতে পারে, দুকূলপ্লাবীও হতে পারে। এই ধরনের গতির প্রকৃতি সামগ্রিক বলেই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানো চলে না। কিন্তু শব্দবিন্যাস ও বাক্যবিন্যাসের বিশিষ্টতার মধ্যে যে গতিভঙ্গিটি ধরা দেয়, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে দৃষ্টান্ত দিই।

গদ্যরীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সাধু ও চলতি উভয় রীতিই অনুসরণ করেছেন। সাধু রীতি ও চলতি রীতির গুণগত পার্থক্য সম্পর্কে আগেই বলেছি। দুই রীতির পার্থক্যের জন্য তাদের বাক্যবিন্যাসের প্রকৃতিও মূলত পৃথক। সাধু রীতির কাঠামোটি এমন যে, সেখানে মুখ্যত জটিল বাক্যের প্রাধান্য; সেখানে একটি মূল বাক্যাংশের সঙ্গে প্রচুর অনুবর্তী বাক্যাংশকে সহজেই শৃঙ্খলিত করা যায়। সাধু রীতির এই বৈশিষ্ট্যটি লাভ হয়েছে মূলত সংস্কৃত রীতি থেকে, পরবর্তী কালে কিছুটা ইংরেজি থেকে। এই রীতিতে শব্দগুলি আশ্চর্য সচলতা ও নমনীয়তা লাভ করে; শব্দগুলি একত্র হয়ে, কখনো পৃথক হয়ে, পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে, মূল বাক্যাংশের কাছে কিংবা দূরে থেকে অর্থের অখণ্ডতা লাভ করে। এই রীতিতে শব্দ ও বাক্যাংশগুলি আশ্চর্য স্থিতিস্থাপক। চলতি রীতিতে এর বৈপরীত্য। সেখানে বাক্যগুলি সরল ও যৌগিক, মূল বাক্যাংশের অনুবর্তী বাক্যাংশের সংখ্যা অত্যন্ত কম। বাক্যগুলি হ্রস্ব, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ এবং বহুক্ষেত্রে গঠিত বাক্যের শব্দ উহ্য। প্রযুক্ত শব্দগুলি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ এবং কম স্থিতিস্থাপক। প্রকৃতপক্ষে, এই রীতিই খাঁটি বাংলা রীতি। বাংলা ভাষা-প্রকৃতির প্রতিভা বা

"প্রকৃতিগত অভিরুচি" এই রীতির মধ্যেই রক্ষিত। বিদ্যাসাগর যে "কৃত্রিম" বাংলা সাধু রীতির কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, তা সফল হয়েছিল ভাষার এই প্রতিভা বা অভিরুচিকে সসম্মান স্বীকৃতি দেওয়ার ফলেই। আর, সেই কারণেই আমরা যে-সাধুভাষাটি লাভ করেছি, তা কৃত্রিম হলেও বাংলা হয়ে উঠতে পেরেছিল। বিদ্যাসাগরের ক্লাসিকাল কাঠামোকে অবলম্বন করেই বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত গদ্যলেখকেরা ক্রমান্বয়ে সাধু রীতিতে চলতি রীতির বৈশিষ্ট্যযোজনা করে এসেছেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে দুই রীতির পারস্পরিক প্রভাবে প্রায় এক নতুন জাতের চলতি রীতির সৃষ্টি হয়েছে।

মুখ্যত জটিল বাক্যে গঠিত খাঁটি সাধু রীতির গতির চাল বা ভঙ্গিটি বিলম্বিত, এর গতিভঙ্গির সৌন্দর্য কোমলে-কঠোরে একেবারে রাজকীয়; চতুরঙ্গ সেনাদলের বর্ণাঢ্য, কোলাহলমুখর অনিবার্য গতির সঙ্গে এর গতির তুলনা চলে। রবীন্দ্রনাথ এই খাঁটি সাধু রীতির চর্চাও দীর্ঘকাল করেছেন। এই রীতির বিলম্বিত ভঙ্গির পরিচয় দিই:

> যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয় তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে; সেইজন্যই সে প্রেম অল্প দিনের মধ্যেই দুর্ভর হইয়া ওঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না। যে আত্মসংবৃত প্রেম সমস্ত সংসারের অনুকূল, যাহা আপনার চারি দিকের ছোটো এবং বড়ো, আত্মীয় এবং পর কাহাকেও ভোলে না, যাহা প্রিয়জনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া বিশ্বপরিধির মধ্যে নিজের মঙ্গলমাধুর্য বিকীর্ণ করে, তাহার ধ্রুবত্বে দেবে মানবে কেহ আঘাত করে না; আঘাত করিলেও তাহা বিচলিত হয় না।—কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা।

এই রীতির কোমল-কঠোর রাজকীয় গতিভঙ্গির দৃষ্টান্ত, যেমন:

> এক-একদিন সন্ধ্যার সময় বড়ো আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্বক শাহজাদার মতো সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরানীর ছায়া আসিয়া পড়িল—পলকের মধ্যে

> গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে ঊর্ধ্বাভিমুখে আবর্তিত করিয়া, মুহূর্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া, দর্পণেই মিলাইয়া গেল।
> —ক্ষুধিত পাষাণ।

এই সাধু রীতির বাক্যবন্ধে চলতি ভাষায় লেখার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও রবীন্দ্রনাথ একসময় করেছিলেন। তার ফলটি কৌতূহলজনক। স্পষ্টই দেখা যাবে, সেখানে ব্যাকরণের দিক থেকে ভাষা চলতি হলেও তাতে সাধু রীতির গতিভঙ্গিই প্রকট। যেমন:

> বিশাল বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে যেমন একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য আছে যেটি থাকাতে সমস্ত চেষ্টার মূর্তি শান্ত ও শক্তির মূর্তি সুন্দর হয়ে উঠেছে—যেটি থাকাতে বিশ্বজগৎ একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা অথবা প্রকাণ্ড কারখানা ঘরের মতো কঠোর আকার ধারণ করে নি—আমাদের চেষ্টার মধ্যে সেই সামঞ্জস্য থাকবে, আমাদের কর্মের মধ্যে সেই সৌন্দর্য ফুটে উঠবে।—রাত্রি।

চলতি রীতির গতিভঙ্গি দ্রুত, কাটাকাটা এবং একটানা; নিয়মিত পদক্ষেপে-ছোটা দৌড়ের ঘোড়ার মতো। এই গতিভঙ্গির বিচিত্র প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের চলতি গদ্যে। যেমন:

> অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাবণ্যকে। লাবণ্যের মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধরে নিয়ে এল। এক মুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল, লাবণ্যর হাতে আংটি। মাথায় রক্ত চন্ করে উঠল, লাল হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল।—শেষের কবিতা।

> দিঘির ওপারের পাড়িতে চালতা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠেছে,

> জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো রাঙা, তার কাঁচাসোনার বরন ফুল, ঘন গন্ধ ভারি হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াশা যেন। জোনাকির দল ঝলমল করছে জারুল গাছের ডালে। শান-বাঁধানো ঘাটের বেদির উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সরলা। বাতাস নেই কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন, জল যেন কালো ছায়ার ফ্রেমে বাঁধানো পালিশ-করা রূপোর আয়না।—মালঞ্চ।

ব্যাকরণের দিক থেকে সাধু রীতির গদ্যে চলতির গতিভঙ্গি আছে চতুরঙ্গ-এর গদ্যে। যেমন:

> জানি না কতক্ষণ পরে—সেটা বোধ করি ঘুম নয়—অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিঃশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা!
>
> তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁয়া আছে—এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই—তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ।

স্টাইলের গতিভঙ্গি ফোটে ক্রিয়াপদের বক্র ব্যবহারে, বাক্যরচনার বিশেষ ভঙ্গিমায়, যেমন—শব্দের স্থান পরিবর্তনে, প্রশ্ন-বিস্ময়বোধক উক্তিতে, সম্বোধনে, কথোপকথনের অন্তরঙ্গতায়, কখনো বা পক্ষ-প্রতিপক্ষের প্রস্তাবনায় এবং এসব ছাড়াও, অর্থযতি স্থাপনের মুনশিয়ানায়। সাধারণভাবে ভাল লেখককে লোকে চেনে রচিত বাক্যগুলির গতি এবং স্টাইলের ভঙ্গিটি দেখেই। তবে এসবই গতির সামগ্রিকতার অঙ্গ, তাই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নেই।

স্টাইলের শেষ কথা ধ্বনির সঙ্গতি। স্বচ্ছতা ও রং আসে অর্থ থেকে; গতি বাক্য রচনার উপর নির্ভর করলেও তার মূলটি থাকে অর্থের মধ্যে। গুণ হিসাবে ধ্বনির সঙ্গতি আগের তিনটি গুণের সঙ্গেই ধারাবাহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। এটি প্রয়োজনীয়, কারণ, কানের সহযোগিতায় ধ্বনি অর্থকে প্রীতিকর করে তোলে। কানই হচ্ছে শব্দে ও অর্থে রচিত তাবৎ শিল্পের গ্রহণ-ইন্দ্রিয়। সেই ইন্দ্রিয়ের প্রীতি ব্যতিরেকে গ্রহীতার কাছে গৃহীত অর্থ প্রীতিকর হতে পারে না। কাব্য-সাহিত্যে ধ্বনি ও অর্থের সঙ্গতি অপরিহার্য। এইজন্যই ধ্বনির সঙ্গতি বলতে ধ্বনি ও অর্থের সঙ্গতি।

স্টাইলের ধ্বনির সঙ্গতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: শব্দের ধ্বনির সঙ্গতি, বাক্যের ধ্বনির সঙ্গতি এবং অনুকরণমূলক ধ্বনির সঙ্গতি। শব্দের ধ্বনির সঙ্গতি হচ্ছে সিলেবল্ বা অক্ষরগুলির পারস্পরিক প্রীতিকর অনুগমন; আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, স্বর ও ব্যঞ্জনের পর্যায়ক্রমে অবস্থান-বৈচিত্র্য। স্বরবর্ণের প্রাচুর্য থেকে পাব বাংলা ভাষার তারল্য, ব্যঞ্জন থেকে দার্ঢ্য; দু'য়ে মিলেই বাংলা ভাষার আশ্চর্য নমনীয়তা।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যের ধ্বনির সঙ্গতি মূলত তরল ও প্রবহমান, যেন জীবন্ত ঝরণার ধারার মতো, যার স্ফটিক স্বচ্ছতায় তিলমাত্র মালিন্য নেই; তা এমনই এক স্ফূর্ত প্রেরণা, ভাবের এমনই স্বচ্ছ প্রকাশ, যে তা প্রায় বিশ্লেষণের অতীত, অনুভবের বস্তু। যেমন:

> মহেন্দ্রের সহিত বাল্যকালের প্রণয় হইতে প্রণয়ের অবসান পর্যন্ত সমস্ত কথা—যে সুদীর্ঘ কাহিনী নানাবর্ণে চিত্রিত, জলে-স্থলে পর্বতে নদীতে বিভক্ত মানচিত্রের মতো তাহার মনের মধ্যে গুটানো ছিল—বিহারী প্রসারিত করিয়া ধরিল।—চোখের বালি।
>
> কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখি ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের লিচুগাছটি কালো। চিত্রপটের উপর গাঢ়তর কালির দাগের মতো লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে। আর আকাশের তারা নির্নিমেষ

সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কী এক রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।—ত্যাগ।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথায় আরোহণ করিল।—নিশীথে।

পালের নৌকায় হঠাৎ পাল ফেটে গেলে তার যে দশা মধুসূদনের তাই হল। তখন আর দেরি করবার লেশমাত্র অবকাশ ছিল না। আপিসে চলে গেল। কিন্তু সকল কাজের ভিতরে ভিতরে তার অসম্পূর্ণ ভাঙা চিন্তার তীক্ষ্ণ ধারগুলো কেবলই যেন ঠেলে ঠেলে বিঁধে বিঁধে উঠছে। এই মানসিক ভূমিকম্পের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা সেদিন তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আপিসে জানিয়ে দিলে উৎকট মাথা ধরেছে, কার্যশেষের অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এল।—যোগাযোগ।

দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে পারিভাষিক অনুপ্রাস থাকলেও এগুলিতে নিছক অনুপ্রাস খুঁজতে গেলে ভুল হবে; বিভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনের পারম্পরিক অনুগমনই—অনুপ্রাস যার একটি দিক মাত্র—এই অব্যাহত বিচিত্র ধ্বনিপ্রবাহের মূলে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

স্টাইলের এই ধ্বনিসঙ্গতি নিছক শব্দের ধ্বনি থেকে আসে না, আসে তাদের বাক্যে বিন্যস্ত করার মধ্য দিয়ে। বাক্যে শব্দের ধ্বনি বিন্যস্ত হয় তালের মাহাত্ম্যে। এই তাল গতির প্রকৃতিও নির্দেশ করে; এবং সর্বোপরি তাল নির্ভর করে ভাবের প্রকৃতির উপরে। তাই ভাববস্তুই মূলত তাল, গতি ও ধ্বনির সঙ্গতির নিয়ামক। ভাববস্তুর প্রকৃতির দিকে নজর না-রেখে বাক্যের তালবিচার করা অর্থহীন। বাক্যের তাল রং গতি ও ধ্বনি—সমস্ত উপাদানকে কী রহস্যময় উপায়ে ভাবের অনিবার্য প্রকাশরূপটি মূর্ত করে তোলে তার একটি দৃষ্টান্ত দিই:

সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা/—চাকা ঘুরিতেছে,/ধ্বজা উড়িতেছে,/পৃথিবী কাঁপিতেছে;/মেঘ উড়িয়াছে,/বাতাস ছুটিয়াছে,/নদী বহিয়াছে,/নৌকা চলিয়াছে,/গান উঠিয়াছে;/দেখিতে দেখিতে

গুরু গুরু শব্দে/মেঘ ডাকিয়া উঠিল,/বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া/ঝলসিয়া উঠিল,/সুদূর অন্ধকার হইতে/একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল।/—অতিথি।

এখানে একটি দীর্ঘ বাক্যাংশের পর স্বল্প বিরতি, যেন রথযাত্রার সাড়ম্বর ঘোষণার পর উন্মুখ ঔৎসুক্য; তারপরই আটটি হ্রস্ব বাক্যাংশের দ্রুত তালে জগতের রথযাত্রার চাকার ঘর্ঘর ধ্বনি কানে আসে; সেমিকোলনে সমাপ্ত তিনটি হ্রস্ব বাক্যাংশে রথের চাকার বিপুল আবর্তনটি চোখের সামনে ভেসে ওঠার পর, চতুর্থ বাক্যাংশ থেকে ক্রিয়াপদের আকস্মিক পরিবর্তনে চাকার আবর্তনের বাধাহীন অনায়াস সম্মুখগতিটি সমতালে মূর্ত হয়ে ওঠে। সাদৃশ্যের চিত্রটি শেষ হবার পরই প্রস্তাবিত বিষয়ের বর্ণনা; আবার কয়েকটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং হ্রস্ব বাক্যাংশের পর সর্বশেষে একটি দীর্ঘ বাক্যাংশ। মেঘের দূরবিস্তারী গর্জন, বিদ্যুদ্দীপ্তির আকস্মিকতার পর যখন প্রকৃতির সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ, অন্ধকার প্রসারিত, প্রবল বর্ষণে ভেসে আসা বৃষ্টির গন্ধ, তখনই বাক্যের সমাপ্তি। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা ভাববস্তুর এই প্রকাশরূপে—রং, গতি, ধ্বনি-সঙ্গতিতে তালের ভূমিকা যে কী, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এ যেন বস্তুর সাক্ষাৎকার!

তালের একটি বড়ো জিনিষ হচ্ছে ধ্বনির উত্থান-পতন (cadence); এই উত্থান-পতন বাক্যের অভ্যন্তরে যেমন, বাক্যের সমাপ্তিতেও তেমনই মূল্যবান। খুঁটিয়ে বিচার করলে, বাক্যের সমাপ্তিতে—যেখানে তালের শেষ, ধ্বনির উত্থান-পতনের দিক থেকে সেটাই মুখ্য। আগের বাক্যের সমাপ্তিচ্ছেদের দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যাবে। তালের ও ধ্বনির এই বিশেষত্বটি সম্পর্কে বোধ ভালো লেখকের সহজাত। রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে এই বিশেষত্বটি খুঁজে বার করতে বিশেষ কোনো চেষ্টা করতে হয় না।

অনুকরণমূলক ধ্বনির সঙ্গতি বলতে বোঝায়, যে-ধ্বনি-সৃষ্টির পিছনে পৃথক প্রযত্নের প্রয়োজন হয়, পারিভাষিক অনুপ্রাস ইত্যাদি যার মধ্যে পড়ে। কিন্তু শব্দের সহজ ধ্বনির সঙ্গতি এবং অনুকরণমূলক ধ্বনির সঙ্গতির মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই, পার্থক্য যা তা মাত্রাগত। অন্তত এদের মধ্যে অনুপ্রাসটি পৃথক প্রযত্নহীন শব্দের স্বতস্ফূর্ত ধ্বনির সঙ্গতির মধ্যে

পড়ে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের অনুপ্রাস অলংকারের আলোচনা আগেই করেছি।

লক্ষণ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্যস্টাইল বিচার করার পরও হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে, সামগ্রিক ভাবে রবীন্দ্রনাথের স্টাইলের গোত্রটি কী? প্রাচীনকালের সেই সরল, পরিমিত ও মহৎ স্টাইলের মতো একালেও "সরল, মধ্যগা ও অলংকৃত" স্টাইল বলে কোনো লেখকের স্টাইলের গোত্র নির্ণয়ের চেষ্টা বৃথা। কারণ, সারল্য, পরিমিতত্ব বা মহত্ব—যার কোনো একটিই একক ভাবে যে-লেখকের ভাবজীবনের বৈশিষ্ট্যনিরূপক নয়, এমন লেখকের স্টাইলকে কী করে ওই একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যে নামাঙ্কিত করা যাবে। যে-লেখকের ভাবজীবনে সারল্য, পরিমিতত্ব, ও মহত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাঁর স্টাইলে তো এইসব বৈশিষ্ট্য থাকবেই। তেমনই অলংকৃত স্টাইল বলে রবীন্দ্রনাথের স্টাইলকে সংজ্ঞিত করলেও মোটেই যথার্থ বলা হয় না; কারণ, যাঁর স্টাইল গভীর আত্মচেতনার উৎস থেকে উৎসারিত, যাঁর রচনারীতিই হচ্ছে সাবজেক্‌টিভ—আত্মচেতনার প্রকাশরীতি, তাঁর ভাষার স্বাভাবিক রূপ-লক্ষণই তো অলংকার। তাঁর স্টাইলকে "অলংকৃত" আখ্যায় ভূষিত করলে অবিচার করা হয়। স্টাইল যদি মানুষটি হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের স্টাইল রবীন্দ্রনাথেরই স্টাইল, আর অন্য কোনো কিছু নয়। পরিমিত স্টাইল ইত্যাদির মতো অলংকৃত স্টাইল বললে রবীন্দ্রনাথের স্টাইলের আংশিক বাহ্য একটি লক্ষণেই সমগ্রকে লক্ষ্য করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন পদ্যসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যের সমান্তরাল চর্চা করেছেন। এমন কথা কে বলবে যে, তাঁর গদ্যসাহিত্য চর্চার প্রেরণা ছিল পদ্যসাহিত্য চর্চার তুলনায় গৌণ। তা যদি না বলা যায়, তাহলে স্টাইল বিচারের ক্ষেত্রে কবি রবীন্দ্রনাথ ও গদ্যলেখক রবীন্দ্রনাথ বলে কোনো পৃথক মাপকাঠি থাকতে পারে না। আমরা তো জানি, গদ্যে ও পদ্যে যে-সাহিত্য রচিত হয়, তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই, যে পার্থক্য তা মাত্রাগত। তাঁর গদ্যকে "মহাকবির গদ্য" বলে ভূষিত করলে "কবি রবীন্দ্রনাথের" প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়; কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান ও অপ্রধানের ধারণাটাই ভ্রান্তিকর। রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু গদ্যই

লিখতেন, তাহলেও তাঁকে "মহাকবি" আখ্যা দেওয়া চলতো। কাব্যবস্তু গদ্যের চেয়ে পদ্যের মাধ্যমেই মানুষকে বেশি আকর্ষণ ও অভিভূত করে থাকে, তাই পদ্যকার রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে গদ্যকার রবীন্দ্রনাথকে আড়াল করে রাখে। কিন্তু গদ্যকার রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে হবে একটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ হিসাবেই; তাঁর কাব্য, তাঁর সংগীত, তাঁর চিত্র—সমস্ত সৃষ্টিকেই দেখতে হবে সমান্তরাল ভাবে। এটি বড়ই বিস্ময়কর যে, রবীন্দ্রনাথের কোনো সৃষ্টিই একে অপরের পরিপূরক নয়। প্রকাশের যত মাধ্যম আছে, সৃষ্টির কাজে রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রায় সবকটিকেই চূড়ান্ত ভাবে ব্যবহার করেছেন, এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় শিল্পী পৃথিবীতে আজো জন্মান নি।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য সূচনা, বিকাশ ও পরিণতির ধারাবাহিকতায় সম্পূর্ণ। তাঁর বিচিত্র প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁর গদ্যেই মিলবে। ব্র্যুফোঁ বলেছিলেন: ভালো লেখার মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয় ও রুচির সমন্বয় ঘটাতে হবে; স্টাইল বললেই বুঝতে হবে, মন ও বুদ্ধির সমস্ত মৌলির শক্তির মেলবন্ধন ও ব্যবহার। চিন্তায়, মননে, ভাবনায়, কল্পনায় নিত্য-উদ্‌বেজিত যে-বিরাট মনটি সুদীর্ঘ কাল ধরে অযুত গদ্যের বাক্যবন্ধে নব নব রূপে প্রকাশিত হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে, রবীন্দ্রনাথের স্টাইল তারই প্রতিচ্ছবি। গল্পে-উপন্যাসে বিচারে-বিতর্কে—গদ্যরচনার বহু বিচিত্র বিচরণক্ষেত্রে একটি মানুষেরই সাক্ষাৎ পাই। এরই সঙ্গে তাঁর স্টাইলে পাই এমন এক পারিপাট্য, রুচি ও বৈদগ্ধ্য—যা মনে পড়িয়ে দেয় মানুষ রবীন্দ্রনাথটিকেও। স্টাইলের মানুষটি থেকে জীবনযাপনকারা মানুষটিকে পৃথক করে দেখার কথা আমরা বলে থাকি, সে দেখাই যে সঠিক দেখা, তাতে সন্দেহ নাই। কারণ, লেখকের জীবনযাপনকারী সত্ত্বা আর ভাবুক সত্ত্বার অমিলটা একটা সাধারণ সত্য। কিন্তু সংসারে সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে। মানুষ-লেখকটি আর লেখক-মানুষটির মধ্যে যদি অমিলের অভাব থাকে, তাহলে স্টাইলে লেখক-মানুষ আর মানুষ-লেখক কেন এক ও অখণ্ড হয়ে দেখা দেবে না। রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যতিক্রমের দলে। যাঁর কাছে জীবনযাপনটাই ছিল কর্ষণের বস্তু, প্রতিদিনের অভ্যাসে আচরণে পারিপাট্য, বৈদগ্ধ্য ও রুচির

অনুশীলনের ক্ষেত্র, যাঁর জীবনের কর্ম ও মননের ধর্ম একটি অখণ্ড ঐক্যের সুতোয় গাঁথা, সেই মানুষ-রবীন্দ্রনাথ এবং লেখক-রবীন্দ্রনাথের স্টাইল অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠতে বাধ্য। "স্টাইল মানুষটি"—ব্যুফোঁর সেই ক্লাসিকাল সংজ্ঞাটি রবীন্দ্রনাথের স্টাইল সম্পর্কে যেন আক্ষরিক অর্থে সত্য।

নির্ঘণ্ট

অচলায়তন ৭৫
অবসরসরোজিনী ৫
অরূপ রতন ৬৮
অলংকার ৯৪ :
—অলংকার ও স্টাইল ৯৪ ;
শব্দালংকার (অনুপ্রাস) ৯৪-৯৫ ;
অর্থালংকার ৯৬ ; আদ্যালংকার ৯৬ ;
উপমা ১০০ ; সংকর ও সংসৃষ্টি ১০৩
অন্তর ও বাহির ১১২

আত্মশক্তি ৩৭
আপনার মুখ আপনি দেখ ১৩
আর্যগাথা ৩২
আলালের ঘরের দুলাল ১১
আলোচনা ২১

উইলিয়ম কেরি ১০, ১১

একেই কি বলে সভ্যতা ১১

কণ্ঠরোধ ৩২
কথোপকথন ১০
করুণা ৩-৫
কল্পনা ৭৩, ৭৫ :
—দুঃসময় ৮৩ ; রাত্রি ; বর্ষশেষ ৮৩ ;
বসন্ত ৮৩ ; বৈশাখ ৮৩

কবিকাহিনী ৭৬, ৭৭
কড়ি ও কোমল ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮১ :
—যৌবনস্বপ্ন ৮১
কুলীনকুলসর্বস্ব ১১
কৃষ্ণকান্তের উইল ৭৮
কৃষ্ণচরিত্র ৩২
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০
কাদম্বরী দেবী ২২
কালীপ্রসন্ন সিংহ ১২
কালের যাত্রা ৬৮
ক্যালকাটা রিভিউ ১৪
ক্ষণিকা ৭৩, ৮৫-৮৬ ;
—কৃষ্ণকলি ৮০ ; নববর্ষা ৮৫

খেয়া ৭৩, ৮৬

গল্পগুচ্ছ
—অতিথি ২৮, ৭০, ১১২ ; অধ্যাপক ১০৭ ;
কর্মফল ৩৫ ; ক্ষুধিত পাষাণ ১০৩, ১১৭ ;
খাতা ১৪ ; খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ৭০ ;
গুপ্তধন ৯৫ ; ঘাটের কথা ২৪, ৭০, ৮২ ;
চোরাই ধন ৮৬ ; ছুটি ৭০ ; ঠাকুরদা ৭০ ;
তপস্বিনী ৫২ ; ত্যাগ ১২০; নষ্টনীড় ৩৬ ;
নিশীথে ১২০ ; পণরক্ষা ৯৬ ; পোস্টমাস্টার
৭০ ; বিচারক ৯৭ ; বোষ্টমী ৪৮ ;
মণিহারা ৩৫ ; মানভঞ্জন ২৯ ;

রাজপথের কথা ২৪ ; রাম কানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা ৭০ ; শেষের রাত্রি ৪৮, ; সম্পত্তি সমর্পণ ১১১ ; সুভা ২৮ ; স্ত্রীর পত্র ৪৫, ৪৭, ৭০, ৯৬ ; হালদার-গোষ্ঠী ৪৭
গীতাঞ্জলি ৫৩, ৭৩, ৮৬
গীতালি ৮৬
গীতিমাল্য ৮৬
গোতিয়ে ১০৮
গোরা ৩৮-২৯, ৪১, ৫৬, ৭৩, ৯৬, ১০২
গোড়ায় গলদ ৭১, ৭২

ঘরে-বাইরে ৪৮-৫২, ৭৫, ৮৮. ৯৬, ১০৪

চণ্ডালিকা ৯০-৯২
চতুরঙ্গ ৪৭-৪৯, ১০২, ১১৮
চলতি ভাষা :
—বৈশিষ্ট্য ১০, ; বিবর্তন ১১-১২ ; নাটকের চলতি ভাষা—রামনারায়ণ ১১ ; মধুসূদন ১১-১২ ; দীনবন্ধু ১১ ; হুতোমী রীতি ১২-১৩ ; চলতি রীতির গতিভঙ্গি ১১৭
চার অধ্যায় ৬৩-৬৪, ৯৯
চিত্রা ৭২, ৭৬, ৮৩
চৈতালি ৮৩
চোখের বালি ৩৬, ৭৩, ১০১, ১১৯

ছড়ার ছন্দ ৮৫
ছবি ও গান ৭৮, ৭৯, ৮০
ছিন্নপত্র ৯, ১৬, ১৭, ১৮. ২৮, ৬৯, ৭১, ৮০
ছেলেবেলা ৬৫
ছোটনাগপুর ২৪, ৮১

জাপানযাত্রা ৫২
জাভাযাত্রীর পত্র ৫২
জীবনস্মৃতি ৫, ৬, ৪১, ৪৬, ৭৪, ৭৮, ৯৯, ১০০, ১০২
জ্ঞানাঙ্কুর ৩, ৫, ৭৬, ৭৮

ডাকঘর ৭৪

তপতী ৬৮
তুর্গেনেভ ৫৩

দীনবন্ধু ১২
দিদেরো ১১২
দ্বিজেন্দ্রনাথ ৭৭
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৩২
দুই বোন ৬২, ৬৩, ৯৭
দুঃখসঙ্গিনী ৫

নলিনী ৭০
নবীনচন্দ্র (নবীন সেন) ৮২
নৈবেদ্য ৭৩
নৌকাডুবি ১০১, ১০৩, ১১৪

পঞ্চভূত :
—কৌতুকহাস্য ৩০ ; পল্লীগ্রামে ৩৫ ; মন ৩০
পত্রপুট ৮৯, ৯২
পথপ্রান্তে ২৫, ৮০
পথ ও পথের প্রান্তে ৫৩
পদ্মাবতী ১২
পরিশেষ ৬০, ৮৮
পয়ার ছন্দ ৮৫

পালামৌ ৩২
পুনশ্চ ৫৩, ৬০, ৬১, ৮৯
পুষ্পাঞ্জলি ২৩, ২৭, ৫৪
পূরবী ৮৮
প্রমথ চৌধুরী ৪৬
প্রবোধচন্দ্রিকা ১১
প্রাচীন সাহিত্য ৩৭ :
—কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ৩৭, ১১৬
প্রবাসী ৩৯
প্রভাতসংগীত ৭৮

ফাল্গুনী ৭৫

বঙ্কিমচন্দ্র ১৪, ১৯, ৩২, ৭৬, ৭৮, ৮১. ১০৯, ১১৬
বঙ্গদর্শন ১৪, ৩২, ৩৬, ৩৮
বনফুল ৭৬, ৭৬
বলাকা ৮৭
বালক ১৫
বিচিত্রা ৫৪
বিদ্যাসাগর ১০, ১১৬
বিবিধ প্রসঙ্গ ২০
বিবেচনা ও অবিবেচনা ৩৬
বিশ্বপরিচয় ৬৫
বিহারীলাল ৩২, ৩৭
বুদ্ধদেব বসু ৫৮
বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ ১২
ব্যুফোঁ ১০৬, ১১৪, ১২৩, ১২৪
ব্রুনতিয়ে ১০৬
বৈকুণ্ঠের খাতা ৭২
বৌঠাকুরানীর হাট ১৯, ২০, ৭৮

ভানুসিংহের পদাবলী ৭৬
ভারতবর্ষ ৩৭
ভারতবর্ষের ইতিহাস ১১৩
ভারতী ৩৯, ১৪, ১৯, ২৩, ২৬, ৭৬
ভিখারিণী ৩, ৪
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩, ১৪, ১৫
ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ৫
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১৩

মধুসূদন (মাইকেল) ১১, ৬৮, ৭৬, ৭৭, ৮১
মহুয়া ৮৮
মানসী ৮১
—অহল্যার প্রতি ৮১ ; নিষ্ফল কামনা ৮৩ ; মেঘদূত ৮১
মালঞ্চ ৬৩, ১১৮
মায়াকানন ১২
মুকুট ২৪, ২৫
মুক্তধারা ৬৮
মৃত্যুঞ্জয় (বিদ্যালংকার) ১১
মেঘনাদবধকাব্য ৩, ৬

যুগান্তর ৩২
যোগাযোগ ৫৫, ৫৬, ৫৭-৫৮, ১২০

রক্তকরবী ৬৮
রসিকতার ফলাফল ৩৩
রাজর্ষি ২৪, ২৫, ৮০, ১০১
রাত্রি ১১৭
রামনারায়ণ তর্করত্ন ১১
রামমোহন রায় ১০
রাশিয়ার চিঠি ৬০
রুদ্ধগৃহে ২৩, ৮০

লাইব্রেরি ২৪, ১১৪
ল্যাবরেটরি ৬৬; ১১২
লিপিকা ৫৩, ৫৪, ৬২, ৮৮ : ১১৪
—পরীর পরিচয় ৫৫ ; পায়ে চলার পথ ৫৪ ; মেঘলা দিনে ৫৪ ; সন্ধ্যা প্রভাত ৫৫. ৮৮
—লিপিকার ধ্বনিরীতি ৮৮-৮৯

শব্দতত্ত্ব ২৬
শর্মিষ্ঠা ১১, ১২
শান্তিনিকেতন ৪৪, ৬৯, ৭৩, ৭৪
শ্যামলী ৮৯
শিবনাথ শাস্ত্রী ৩২
শেষ কথা ৯৬
শেষের কবিতা ৫৫, ৫৭, ৫৮, ১০৮, ১১৭
শেষ সপ্তক ৮৯
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৩২
শ্রাবণসন্ধ্যা ১০৮

সংগীত ও কবিতা ২১
সঞ্জীবচন্দ্র ৩২
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৩২
সন্ধ্যাসংগীত ৭৮
সভ্যতার সংকট ৯২
সবুজপত্র ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৮৬-৮৭
সমাজ কুচিত্র ১৩
সমালোচনা ২১
সাধু রীতি :
—বৈশিষ্ট্য ৮৭, ১১৫ ; চলতি রীতির সঙ্গে ৮৭, ১১৫ পার্থক্য ১১৬-১১৭
সাধনা ৩০, ৩২
সোনার তরী ৭২, ৭৩, ৮৩ :
—যেতে নাহি দিব ৮৩ ; বসুন্ধরা ৮৩
সরোজিনীপ্রয়াণ ২৪, ৮১
স্টাইল :
—সংজ্ঞা ১০৫-১০৬ ; গুণ ১০৮-১০৯ ; ভেদ ১০৮
স্যাঁৎ-ব্যভ ১০৬, ১১৪
স্বপ্নপ্রয়াণ ৭৬

হরিদাসের গুপ্তকথা ১৪
হেক্টরবধ ৭৬
হেমচন্দ্র (হেম বাঁড়ুজ্জে) ৮২
হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ১২, ১৩, ১৪

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১৬, ১৭, ১৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৬
য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ৯, ১৭, ১৮, ৬১, ৭৮, ১১৩

Acc. No. 4512
Date 7/4/15
Call No. 891.4439/SAN